Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমনা শারমিন

রোলঃ ২১৫০০১৫৭৩

১ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমনা শারমিন

রোলঃ ২১৫০০১৫৭৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমনা শারমিন, আইডিঃ ২১৫০০১৫৭৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সুমনা শারমিন

আইডিঃ ২১৫০০১৫৭৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

টপিক ১ সালাত কি ? সালাতের পরিচয় ১

টপিক ২ নামাজের সূচনা ৪

টপিক ৩ সালাত কাদের জন্য আবশ্যক ১০

টপিক ৪ নামাজের ফরজ সমূহ ১১

টপিক ৫ ফরজ নামাজের ফজিলত ১৬

টপিক ৬ জামাতে সালাত পড়ার ফজিলত ২১

টপিক ৭ সালাত ত্যাগ কারীর বিধান ২৪

টপিক ৮ নামাজ ভঙ্গ হওয়ার প্রসিদ্ধ কারণ ২৭

টপিক ৯ জুমআর নামাজের ফজিলত ৩১

টপিক ১০ দৈনন্দিন সুন্নত নামাজ ৪২

টপিক ১১ দৈনন্দিন নফল নামাজ ৪৪

টপিক ১২ সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময় ৪৮

টপিক ১৩ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সালাতের গুরুত্ব ৬৩

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহু ছোবহান তায়ালার দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং অগনিত দরুদ ও সালাম জানাই নবীকূল শিরোমনি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাহিসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযিল্লাহুআনহুম এর প্রতি।

ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত, কালেমার পরই ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান ও গুরুত্ব পূর্ণ খুঁটি হলো নামাজ। আল্লাহু ছোবহান তায়ালার খাছ খাজানা থেকে চেয়ে নেওয়ার প্রথম ও প্রধান উপায় হলো আল্লাহু ছোবহান তয়ালার হুকুম আহ্কাম সমূহ হুজুরে পাক (সাঃ) এর তরীকায় পুরা করা তম্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদি আমল হইলো নামাজ। মহান আল্লাহু ছোবহান তয়ালা সমস্ত নেক আমল সমূহ হুজুর পাক (সাঃ কে দান করেছেন হযরত জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে কিন্তু এই বুনিয়াদি আমল নামাজ মহান আল্লাহ ছোবহান তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিব হুজুর পাক (সাঃ) কে মেরাজে নিয়ে নিজ কুদরতি হাতে দান করেছেন ।

সালাতের পরিচয়

‘সালাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো, দোয়া করা, কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা,দয়া করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত, ইসতিগফার ইত্যাদি। শরিআতের পরিভাষায়, আল্লাহতাআলার নির্দেশিত বিশেষ একটি ইবাদত যা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত বিধিবিধান মোতাবেক রুকু সিজদাসহকারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, তাকে সালাত বলা হয়।

সালাতকে নামাজও বলা হয়। নামাজ ফারসি শব্দ। ইসলামে নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম।ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটি দ্বিতীয় স্তম্ভ। সালাত কুরআন, হাদিস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত সর্বসম্মত একটি ফরজ। নামাজকে দ্বীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না, তেমনি নামাজ ব্যতিরেকে দীন পরিপূর্ণ হয় না। প্রত্যেক বালেগ, সুস্থ ও জ্ঞানবাদ পুরুষ ও মহিলার ওপর নামাজ ফরজে আইন। শরিআসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করা কবিরা গুনাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কি জীবনে মিরাজের সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। নামাজের ফরজিয়াতকে অস্বীকার করলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। একজন লোকের ঈমানের মান ও বাস্তবরুপ প্রকাশ পায় তার সালাত আদায়ের মাধ্যমে। সালাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের কয়েকটি উদ্ধৃতি এরূপঃ

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ.

১। নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিশয় কৃপণ। সলাত আদায়কারীগণ ছাড়া । (সূরা মা’আরিজ,আয়াতঃ ১৯-২২)

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب
২। কখনো নয়, তুমি তার আনুগত্য করবে না। আর সিজদা কর এবং নৈকট্য লাভ কর। (সূরা আলাক,আয়াতঃ ১৯)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ

৩। অতএব সেই সলাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ,যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী,যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, (সূরা মাউন,আয়াতঃ ৪-৬)

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

৪। তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সলাত কায়েম কর। নিশ্চয় সলাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (সূরা আনকাবুত,আয়াতঃ ৪৫)
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ

৫। আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (সূরা বাকারা,আয়াতঃ ৪৫)

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

৬। আর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারা,আয়াতঃ ৪৩)

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِين
৭। তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সূরা বাকারা,আয়াতঃ ২৩৮)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

৮। আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সলাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা ত্বাহা,আয়াতঃ ১৩২)

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ

৯। যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত। (সূরা মুমিনুন,আয়াতঃ ১-২)

১০। মুমিন ও কুফরের মধ্যে সালাত হলো পার্থক্যকারী। (সহীহ বুখারী শরীফ)

১১। দীন ইসলামের সমগ্র বিধানটি এ নামাজের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। মাহান আল্লাহর বাণী হতে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন,

قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ

আমার বান্দাদের বল, ‘যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও। (সূরা ইব্রাহীম,আয়াতঃ ৩১)

১২। আরো বলা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ’ কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।(সূরা আল-হাজ্জ,আয়াতঃ ৭৭

নামাজের সূচনা

ইসলামের সূচনালগ্নে মক্কার পরিস্থিতি মুসলমানের অনুকূলে ছিল না। তা ছাড়া রাসুল (সা.)-এর প্রতি অহির নতুনত্ব ও মানুষের বিরোধিতা ছিল। বিপরীতে মদিনা ছিল ইসলামের অনুকূলে। মদিনাবাসী ছিল রাসুল (সা.)-এর ভক্ত। তাই মক্কার পরিবর্তে মদিনায় নামাজের চূড়ান্ত রূপ ও পরিপূর্ণ বিধান দেওয়া হয়। ইবনে হাজার হাইতামি (রহ.) বলেন, 'মেরাজের আগে শুধু তাওহিদের বাণী প্রচার করার দায়িত্ব ছিল, অন্য বিধান ছিল না। এরপর নবুওয়তের পর আল্লাহতায়ালা রাসুল (সা.)-এর ওপর রাতের নামাজ আবশ্যক করেন। তারপর পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মাধ্যমে তা রহিত হয়।' (তারিখুস সালাত : ২২)।

মেরাজের আগে নামাজ

মেরাজের আগে একবার জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.)-কে নিয়ে অজু করে জামাতে নামাজ পড়লেন। এরপর রাসুল (সা.) খাদিজা (রা.)-কে নিয়ে জামাতে নামাজ পড়েছেন। আরেকবার তিনি আলী (রা.)-কে নিয়ে কাবাপ্রাঙ্গণে জামাতে নামাজ পড়ছিলেন, তখন আবু তালেব তাদের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অথচ মেরাজের আগে খাদিজা (রা.) ও আবু তালেবের ইন্তেকাল হয়। (সিরাতে ইবনে হিশাম : ১৫৭)। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, মেরাজের আগেও নামাজ ছিল। তবে কেউ কেউ বলেন ' ,মেরাজের আগে শুধু রাসুল (সা'এর ওপর তাহাজ্জুদ আবশ্যক ছিল।-(.

নামাজ ফরজ হয় যখন

মেরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু সে রাতের নির্দিষ্ট সময় নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেন, 'হিজরতের তিন বছর আগে।' কেউ বলেন, 'এক বছর আগে।' কারও মতে রাসুল (সা.)-এর ৫১ বছর বয়সে। কেউ বলেন, 'নবুওয়তের ১৫ মাস পরে সংঘটিত হয়।' (তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩)। এ সময়গুলোর ভেতরই তা সংঘটিত হয়।

নামাজের ওয়াক্ত ও রাকাত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ১৭ রাকাত নামাজ ফরজ। কিন্তু ইসলামের শুরুতে এমনটি ছিল না; বরং মেরাজের আগে সকাল-সন্ধ্যায় দু'রাকাতবিশিষ্ট মোট দু'ওয়াক্ত নামাজ ছিল। মুকাতিল (রহ.) বলেন, 'ইসলামের শুরুতে সকাল-সন্ধ্যায় দু'ওয়াক্ত নামাজ ছিল।' (তারিখুস সালাত : ২৮)। এরপর মেরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। তবে আগের মতো দু'রাকাতবিশিষ্ট রাখা হয়। মদিনায় হিজরতের পর রাকাত সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়। আয়েশা ' ,বলেন (.রা)যখন নামাজ ফরজ করা হয়, তখন তা দু'রাকাতবিশিষ্ট ছিল। এরপর নামাজের রাকাত সংখ্যায় দু'রাকাত করে বাড়ানো হয়।' (বোখারি : ৩৫০)।

ফজরের নামাজ এর ইতিহাস

হযরত আদম (আঃ) যখন বেহেশত হতে এ দুনিয়ায় নির্বাসিত হন তখন একদিকে ছিল রাত্রির ঘোর অন্ধকার , অপরদিকে ছিল শ্বাপদকুলের ভয়। তিনি এদের থেকে বাঁচবার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে আশ্রয় চেয়ে প্রথমে এক রাকআত নামায পড়তে গিয়ে সেজদায় পড়ে যান। পরে যখন অন্ধকার কেটে ফর্সা হয়ে এলো , শ্বাপদকুলও স্ব-স্ব স্থানে লুকিয়ে পড়লো, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া স্বরূপ আরও এক রাকআত নামায আদায় করলেন। মহান আল্লাহ পাক আদম (আঃ) এর উক্ত দুই রাকআত নামাযের প্রতি এতোই খুশি হয়েছিলেন যে , পরবর্তীতে উম্মতে মুহাম্মদির জন্য উক্ত দুই রাকআত নামাযকে ফজরের নামায হিসেবে ফরজ করে দেন।

যোহর এর নামাজ এর ইতিহাস

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিম্নে বর্ণিত চারটি কারণে যোহরের সময় চার রাকআত নামায পড়েছিলেনঃ

(ক) হযরত ইবরাহীম (আঃ) চিন্তিত ছিলেন যে, কিভাবে তিনি আল্লাহ তাআলার আদেশে কোরবানির আদেশ পালন করবেন।

(খ) আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসমাইল (আঃ) এর কোরবানি চেয়েছিলেন। আর তা তিনি কিভাবে তা প্রতিপালন করবেন।

(গ) হযরত ইসমাইল (আঃ) এর মাতা হযরত হাজেরা (আঃ) এর নিকট কি উত্তর দিবেন।

(ঘ) হযরত বিবি হাজেরা (আঃ)জঙ্গলের মাঝে একা একা কিভাবে আছেন।আল্লাহ পাক বেহেশত থেকে দুম্বা প্রেরণ করলেন। আর হযরত ইসমাইল (আঃ)এর স্থলে দুম্বা কোরবানি হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম চক্ষু খুলে হযরত ইসমাইল (আঃ) কে জীবিত দণ্ডায়মান দেখে এবং চারটি সমস্যার সমাধান হয়েছে দেখে মহান আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া স্বরূপ যোহরের সময় চার রাকআত নামায পড়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উক্ত চার রাকআত নামায এতোই বেশি ভাল লাগে যে, পরবর্তীকালে উম্মতে মুহাম্মদির উপর যোহরের সময় উক্ত চার রাকআত নামাযকে ফরজ করে দিয়েছেন।

আসরের নামাজের ইতিহাসঃ

হযরত ইউনুছ (আঃ) সাগর গর্ভে নিম্নে বর্ণিত চারটি মুছিবতে পড়ে তা থেকে উদ্ধার পেয়ে এই নামায পড়েছিলেনঃ যথা;

এক. নীল দরিয়ার পানির ভিতরের অন্ধকার।

দুই. মাছের পেটের ভিতর অধিকতর অন্ধকার।

তিন. উক্ত মাছকে অন্য আরেকটি বিরাট মাছের ভক্ষণ করায় অধিকতর ঘোর অন্ধকার।

চার. তদুপরি রাত্রির অন্ধকার।তিনি মাছের পেটে থেকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে “দোয়া ইউনুস” অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ যোয়ালিমীন পাঠ করেন। অবশেষে চল্লিশদিন অন্তে দিবা শেষে আসরের সময় তাকে নীল দরিয়ার কুলে বালু চরে মাছ উদগীরণ করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া স্বরূপ তিনি আসরের সময় চার রাকআত নামায আদায় করেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে উক্ত চার রাকাত নামায এতোই বেশি ভাল লাগে যে, পরবর্তীকালে উম্মতে মুহাম্মদির উপর উক্ত চার রাকআত নামাযকে আসরের নামায হিসেবে ফরজ করে দিয়েছেন।কোরআন বলছে- যদি তিনি তাসবীহ না পড়তেন, কেয়ামত পর্যন্ত মৎস উদরেই থেকে যেতেন। তাই মাছ তাঁকে স্থলভাগে এসে উগরে দিল। (তাফসীর, সূরা সাফফাত, আয়াত ১৪৩ ও ১৪৪)

মাগরিবের নামাজের ইতিহাসঃ

এ ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। (কাহিনি দীর্ঘ – সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল)

প্রথম মতঃ

ইয়াকুব (আঃ) তার হারিয়ে যাওয়া পুত্র হযরত ইউছুফ (আঃ)এর জন্য কাঁদতে কাঁদতে তার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ কাহিনি শেষে তার দশ পুত্র যখন হযরত ইউছুফ (আঃ)এর কোর্তা নিয়ে মিশর থেকে ফিরে এসে তাঁকে দেয় এবং তিনি তা তার চক্ষে বুলালেন তখনই তার চক্ষুদ্বয় ভাল হয়ে গেল এবং তিনি দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে গেলেন। সে সময় তিনি তিনটি নেয়ামত পাওয়ার শোকরিয়া স্বরূপ মাগরিবের সময় তিন রাকআত নামায পড়েছিলেন। সে তিনটি নেয়ামত হলঃ

এক. চক্ষুদ্বয় ভাল হয়ে যাওয়া।

দুই. আল্লাহর নবী হযরত ইউছুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জীবিত পাওয়া।

তিন. আল্লাহর নবী হযরত ইউছুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইসলামের উপর পাওয়া।

দ্বিতীয় মতঃ

নাসারা বা খ্রিস্টানগণ নবী হযরত ঈসা (আঃ) এ যখন হত্যা করার জন্য ঘিরে ফেলে তখন আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতে ঘরের ছাঁদ ফুঁড়ে তাঁকে আকাশে নিয়ে যান। পরে তাকে আল্লাহ পাক জানান যে, তাকে পুনরায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত করে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) শুকরিয়া স্বরূপ মাগরিবের সময় তিন রাকআত নামাজ পড়েছিলেন।

হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত তিন রাকআত নামায আল্লাহর কাছে এতটাই ভাল লাগে যে, যার জন্য পরবর্তীকালে উম্মতে মুহাম্মদির উপর মাগরিবের নামায হিসেবে ফরজ করে দিয়েছেন।

এশার নামাজের ওয়াক্ত এর ইতিহাসঃ

হযরত মুসা (আঃ) এ নামায পড়েছিলেন। ফিরাউনের সৈন্য দল যখন তাকে এবং তাঁর সহগামীদের আক্রমণ করতে করতে নীল নদ পর্যন্ত নিয়ে এল তখন তিনি চার প্রকার চিন্তায় পড়েছিলেন।

সেগুলো হলোঃ

(ক) তিনি নিজে কীভাবে নীল নদ পার হবেন

(খ) উম্মত ইসরাইলদিগকে কীভানে নীল নদ পার করিয়ে অপর তীরে নিয়ে যাবেন

(গ) ফিরাউনের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন

(ঘ) ফিরাউন ও তার লস্করদিগকে কীভাবে ধ্বংস করবেন।

মহান আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মুসা (আঃ) ও তার উম্মতসহ নীল নদ পার করিয়ে অপর তীরে নিয়ে গিয়ে ফেরাউন ও তার লস্করদিগকে নীল নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে তাকে মুক্ত করলেন তখন আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হযরত মুসা (আঃ) চার রাকআত নামায পড়েছিলেন। তার উক্ত চার রাকআত নামায মহান আল্লাহর নিকট এতোই প্রিয় হয় যে, পরবর্তীকালে উক্ত নামাজ উম্মতে মুহাম্মদির উপর এশার নামায হিসেবে ফরজ করে দিয়েছেন। কোরআন কারীমে এর বর্ণনা এসেছে - '..আর আমি ফেরাউন এবং তার পুরো বাহিনিকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম'।(সূরা বাকারা, আয়াত ৫০)।

পাদটিকাঃ

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং অব্যবহিত পরে সূরা মু'মিন-এর ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকাল ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামাজ মুসলিমদের জন্য ফরজ হওয়ার নির্দেশনা লাভ করেন। তিনি ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে দৈনিক তিন ওয়াক্ত নামাজের আদেশ লাভ করেন। ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে রজব তারিখে মিরাজের সময় পাঁচওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

রাসুল (সা.) এক রাতে হজরত উম্মে হানি (রা.)-এর ঘরে বিশ্রামে ছিলেন। তার অর্ধনিদ্রা অবস্থায় জিবরাইল (আ.) অন্যান্য ফেরেশতাসহ ওই ঘরে অবতরণ করেন এবং তাকে মসজিদে হারামে নিয়ে যান। রাসুলের কলিজা বের করে তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর বুরাক নাম বাহনে তাকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। (বুখারি, হাদিস নংঃ ৩৮৮৭, মুসলিম, হাদিস নংঃ ২৬৭)।

জিবরাইল (আ.) তার সামনে এক পাত্র শরাব ও এক পাত্র দুধ নিয়ে আসেন। রাসুল (সা.) দুধের পাত্রটি গ্রহণ করেন। তখন জিবরাইল (আ.)বললেন, আপনি ফিতরাত (স্বভাবজাত ও প্রকৃত জিনিস) গ্রহণ করেছেন।(মুসলিম, হাদিস নং: ২৫৯)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বায়তুল মামুরেও রাসুল (সা.)-এর সামনে ওই দুটি পাত্রসহ একটি মধুর পাত্রও আনা হয়েছিল।সেখানেও তিনি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করেন। (বুখারি, হাদিস নং: ৩৮৮৭, মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৪)।

এরপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপঢৌকনস্বরূপ ৫০ ওয়াক্ত নামাজের বিধান দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো। পথিমধ্যে মুসা (আ.)-এর পরামর্শক্রমে কয়েকবার আল্লাহর কাছে গিয়ে নামাজের সংখ্যা কমানোর আবেদন জানান। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলো।

(বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৯, ৩৩৪২, ৩৮৮৭; মুসলিম,

হাদিস নং: ২৬৩ ও ২৬৪; ফাতহুল বারি: ৭/২৫০-২৫৯,

মা'আরেফুল কোরআন : ৭৬৪-৭৬৫, সিরাতে মুস্তফা : ১/২৮৫-২৮৬)। *তথ্যসুত্রঃ*

(১) নামাজের ইতিহাস বিষয়ে আলেমগণের বয়ানঃ মুফতি মাওলানা বজলুর রশিদ মিয়াঁ ; মাওলানা আলী হোসেন ফারুকী ; মুফতি মাওলানা ফয়েজউল্লাহ আইয়ুবী ; মাওলানা আব্দুল জব্বার ফারুকী ; মাওলানা মিজানুর রহমান মিসবাহ ; মাওলানা রেজাউল করিম নিজামী শাহ; ইউটিউব থেকে সংগ্রহের তারিখ ১৫/১৬ এপ্রিল ২০২২ [আলেম এর নাম এবং সঠিক শিরোনামসহ ht t p://www.yout ube.com/ হতে সার্চ দিয়ে যে কেউ যাচাই করতে পারেন; সাইট সংখ্যা অনেক হওয়ায় সব উল্লেখ করতে পারলাম না];

(২) নামাযের উৎপত্তিঃ মুহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম , ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; হতে সংগ্রহ ১৫ এপ্রিল ২০২২;

(৩) আমলে নাযাতঃ রচনা -মাওলানা মোঃ আল -আমিন; রাবেয়া বুক হাউস , প্রকাশ ২০১৪; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইতিহাস , ht t ps://r adi news24.wor dpr ess.com/2015/11/17/পাঁচ-ওয়াক্ত-নামাজের-ইতিহ/ হতে সংগ্রহ ১৬ এপ্রিল ২০২২;

সালাত কাদের জন্য আবশ্যক

সালাত এমন এক ফরয যা ধনী ,গরীব,স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সকল মুমিন মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রত্যেক আকিল বালিগ নর-নারীর ওপর সর্বাবস্থায় ফরজ সুস্থ ব্যক্তির ওপর যেমন ফরজ , অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ঠিক তেমন ফরজ। মুকিমের ওপর যেমন ফরজ তেমনি ফরজ মুসাফিরের ওপর। এমনকি জেহাদের মত কঠিন সফরের হালতে ও তা ফরজ। দুশমন যখন মুসলমানদের ওপর হামলা করছে তখনও তা ফরজ। যুদ্ধের ময়দানে প্রয়োজনে বিশেষ সালাত আদায় করতে হবে। শরীয়তে যার নাম হল সালাতুল খউফ বা ভয় বিতের নামাজ। এমনকি এত বেশি অসুস্থ হয় যে দাঁড়িয়ে পারে না তাকে বসে পড়তে হবে যদি বসে পড়তে না পারে তাহলে সব অবস্থায় পড়বে। তাতেও যদি সম্ভব না হয় ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা আদায় করবে কোরআনুল কারীমে রব্বুল আলামিন বিভিন্ন আয়াতে সালাতের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন।যাকাত সবার উপর ফরয নয়।যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক শুধু তার উপর বছরে ১ বার ফরয।তুদ্রুপ রোযা সারা বছর ফরয নয় বরং শুধু রমযান মাসে ফরয।তদ্রুপ হজ্জ শুধু সক্ষম ও সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর ফরয এবং তাও আবার জীবনে একবার।

পরিণত বয়সে নামায নিয়মিত আদায় করতে এবং নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে গড়ে তুলতে শৈশব থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হয়ে থাকে। দেখে দেখে শিখতে পছন্দ করে। শৈশব থেকেই তাদের ভাল কিছুর প্রতি উৎসাহিত করতে হয়। শৈশবে যে অভ্যাস গড়ে উঠে পরিণত বয়সে তারই অনুসরণ করতে মানুষ ভালবাসে।

রাসুলুল্লাহ(সাঃ)বলেছেন,'সাত বছর বয়স হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের জন্য নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হলে (নামায না পড়লে) তাদের প্রহার কর আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

নামাজের ফরজসমূহ (আরকান ও আহকাম):

আহকাম ও আরকান মিলিয়ে নামাজের ফরজ মোট ১৩টি। নামাজ শুরু হওয়ার আগে বাইরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আহকাম বলা হয়।

নামাজের আহকাম ৭টি। যথাঃ

১. শরীর পাক হওয়াঃ এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে , গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও , তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর , মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

২. কাপড় পাক হওয়াঃ পরনের জামা , পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৪)

৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়াঃ অর্থাৎ নামাজির দু 'পা, দু'হাঁটু,দু'হাত ও সিজদার স্থান পাক হওয়া।

৪. সতর বা শরীর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু 'হাতের কব্জি,পদদ্বয় এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِ

অর্থঃ হে বনী আদম , তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর। (সূরা আরাফঃ৩১)

৫. কিবলামুখী হওয়াঃ কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও , তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক , তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। (সূরা বাকারাঃ ১৫০)

৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সময়মতো আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا নিশ্চয় সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (সূরা নিসাঃ১০৩)

৭. নামাজের নিয়্যাত করাঃ নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়্যাত করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ إنما الأعمال بالنية নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারী,হাদিস-১)

নামাজ শুরু করার পর নামাজের ভেতরে যেসব কাজ ফরজ , সেগুলোকে নামাজের আরকান বলা হয়।

নামাজের আরকান ৬টি।যথাঃ

১. তাকবিরে-তাহরিমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْআর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা মুদ্দাসসিরঃ৩)

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ মানে কিয়াম করা। আল্লাহ বলেনঃ حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৮)

৩. ক্বেরাত পড়াঃ চার রাকাতনিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দু 'রাকাত এবং ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরজ। আল্লাহ বলেনঃ

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। (সূরা মুযাম্মিল,আয়াতঃ ২০)

৪. রুকু করাঃ প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফরজ।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

অর্থঃআর তোমরা সলাত কায়েম কর , যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারাঃ৪৩)

৫. সিজদা করাঃ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফরজ।আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক করাঃ নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ

অর্থ, “অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে। সূত্রঃ বুক অব ইসলামিক নলেজ, লেখকঃ ইকবাল কবীর মোহন

নামাযের ওয়াজিবসমূহঃ

ওয়াজিব অর্থ হলো আবাশ্যক। নামাযের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। যা ভুলক্রমে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। নিচে ওয়াজিবসমূহ উপস্থাপন করা হলো। রুকন এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান , যা আবাশ্যিক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক(বাদ) করলে নামায বাতিল হয়ে যায় এবং ভূলক্রমে তরক করলে 'সিজদায়ে সাহু' দিতে হয়। নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪টি।যথাঃ

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ ফরয নামাযের প্রথম দু ' রাক'আতে এবং সকল প্রকার নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয , ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সব ধরণের নামাযের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহতুল্লাহ আলাই) এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহ আলাই)এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর দলিল-

لاً صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَا تِحَةِ الْكِتاَبِ"যে নামাযে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" (বুখারী)

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোঃ ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু 'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক।

৩. তারতীব মত নামায আদায় করাঃ তারতীব অনুযায়ী নামায অর্থাৎ নামাযে যে সকল কাজ বারবার আসে ঐ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। যেমন রুকু , ও সিজদা যা নামাযের প্রতি রাক 'আতে বারবার আসে। কিরা 'আত পাঠ শেষ করে রুকু ' এবং রুকু শেষ করে উঠে সিজদা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায নষ্ট হবে এবং নতুন করে নামায আদায় করতে হবে।

৪. প্রথম বৈঠকঃ চার রাকা'আত ও তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু রাকা'আত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব।

৫. আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করাঃ নামাযের উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব। আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন , তুমি আত্তাহিয়্যাতু পড়। সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিই প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

৬. প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করাঃ যে সকল নামাযে প্রকাশ্য বা উচ্চঃস্বরে কিরা 'আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে প্রকাশ্য কিরা 'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন-ফজর , মাগরিব, ইশা, জুমু'আ' দু'ঈদের নামায ও তারাবীর নামায। অবশ্য একাকী আদায় করলে কিরা'আত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক নয়।

৭. চুপিসারে কিরা 'আত পাঠ করাঃ যেমন নামাযে চুপে চুপে কিরা 'আত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেসব নামাযে নীরবে বা চুপে চুপে কিরা'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন-যোহর ও আসরের নামায।

৮. তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করাঃ নামাযের সব কাজ ধীরে-সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু ' ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা ওয়াজিব।

৯. রুকু'থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোঃ অর্থাৎ রুকু ' শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১০. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসাঃ দু ' সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।
১১. সালাম বলাঃ নামায শেষে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে নামায শেষ করা। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর মতে এটি ফরজ।

১২. তারতীব ঠিক রাখাঃ প্রত্যেক রাকা 'আতের তারতীব বা ধারাবাহীকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

১৩. দু'আ কুনুত পাঠ করাঃ বেতরের নামাযে দু'আ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।

১৪. ঈদের নামাযে তাকবীরঃ দুই ঈদের নামযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

ফরজ নামাজের ফজিলত

ঈমানের পরে মুমিন নর ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত সময়মত আদায় করা। আরবী ভাষায় সালাত অর্থ প্রার্থনা। ইসলামের পরিভাষায় সালাত অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো নির্ধারিত পদ্ধতিতে রুকু্‌ সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর ও দোয়া করা। কুরআন ও হাদীসে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আর কোনো ইবাদতকে দেওয়া হয় নি। কুরআনে প্রায় ৮০ স্থানে আল্লাহ সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে।

সালাত বা নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সকল বিধান সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ রোযা কাযা করতে পারেন এবং পরে রাখতে পারেন। একেবারে অক্ষম মানুষ ফিদইয়া- কাফফারা দিতে পারেন। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেই বিধান নেই। সালাতকে অন্যভাবে সহজ করা হয়েছে। তা হলো মুমিন যেভাবে পারেন তা আদায় করবেন। সম্ভব হলে পূর্ণ নিয়মানুসারে।

না হলে দাঁড়িয়ে,বসে, শুয়ে, দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে, যানবাহনে আরোহণ রত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে, উলঙ্গ হয়ে... যে ভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। কোনো সূরা, কিরাআত বা দোয়া না জানা থাকলে শুধুমাত্র আল্ল|হু আকবার বলে বলে বা তাসবীহ-তাহলীল-এর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সময় মত হাযিরা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে, ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা।

আল্লাহ বলেনঃ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যতবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"

সালাতকে আমরা দায়িত্ব মনে করি।
আসলে সালাত দায়িত্ব নয়, সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন:
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون "মুমিনগঅন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"3

সালাত হল,

মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছেঃ

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

"নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।

সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

"যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন: না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।

নামাজ ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। যেকোনো ইবাদতের তুলনায় নামাজের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করলে ইহকাল পরকালে অনেক পুরস্কারের কথা এসেছে কোরআন-হাদিসে। এখানে ৫টি বড় পুরস্কার তুলে ধরা হলো।

১. পবিত্র বান্দার খেতাব

আল্লাহ তাআলা পবিত্র বান্দাদের ভালোবাসেন। জান্নাতেও ঠিকানা হবে শুধুমাত্র পবিত্র বান্দাদের। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'ইসলাম পরিচ্ছন্ন। সুতরাং তোমরা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করো। নিশ্চয়ই জান্নাতে কেবল পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে।' (ফাইজুল কাদির: ৩০৬৫) অন্য হাদিসে মহানবী (স.) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর দ্বীনের ভিত্তি স্থাপিত।' (মাউসুআতু আতরাফিল হাদিস আন-নাবাবি, পৃষ্ঠা-২৯৪)

নবীজি বলেছেন, নামাজিরা হলো পবিত্র বান্দা। তাদের কোনো গুনাহ থাকে না। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুল (স.)-কে বলতে শুনেছেন, 'বল তো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসুল (স.) বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।' (সহিহ বুখারি: ৫২৮)

২. অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে হেফাজত

নামাজিদের অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা আনকাবুত: ৪৫) যারা নামাজ পড়ার পরও অশ্লীল কাজ করে, বুঝতে হবে তাদের নামাজ হচ্ছে না। হয়ত তাদের উপার্জন হারাম, নতুবা তাদের অজু-গোসল হচ্ছে না। এমনও হতে পারে, তার ইবাদত রিয়ামুক্ত নয় কিংবা তার রুকু-সেজদা সঠিক নয়।

৩. আল্লাহর ক্ষমা লাভ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে আদায় করলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ক্ষমা করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকু ও পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, অন্যথায় শাস্তি দেবেন।' (সুনানে আবি দাউদ: ৪২৫)

৪. ফেরেশতাদের দোয়া লাভ

সময়মতো নামাজ আদায়ের জন্য যারা সময়ের আগেই মসজিদে উপস্থিত হয় এবং নামাজের জন্য অপেক্ষা করে ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া করে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যে পর্যন্ত মসজিদে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে, সে যেন নামাজের মধ্যেই থাকে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মসজিদে থাকে ফেরেশতারা সে পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।' অজু ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্য দোয়া চলতে থাকে। (তিরমিজিঃ ৩৩০)

৫. জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে আদায় করলে তার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা নিজেদের নামাজের হেফাজত করে তারাই জান্নাতে সম্মানের পাত্র হবে।' (সুরা মাআরিজঃ ৩৫)

মহানবী (স.) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবহেলার কারণে এর কোনোটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (যথাযথভাবে) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (সুনানে আবি দাউদঃ ১৪২০)

৬. রিজিকে প্রশস্ততা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দেই এবং আল্লাহকে ভয় করার পরিণাম শুভ তথা কল্যাণকার।' (সুরা ত্বাহাঃ ১৩২) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মহাপবিত্র আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর হতাশা দিয়ে পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব না।' (ইবনে মাজাহঃ ৪১০৭)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যথাসময়ে যথানিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

জামাতে সালাত পড়ার ফজিলত

জামাতে সালাত আদায় কারীদের জন্য মহান আল্লাহ যে সব ফজিলতের ঘোষণা দিয়েছেন, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, যখন কোন কাজের লাভ ও উপকারিতা জানা থাকে, তখন সে কাজ করার প্রতি আগ্রহ জাগে এবং কাজটি করতে উৎসাহ পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, জামাতে সালাত আদায়ের অনেক ফজিলত ও লাভ রয়েছে, কিন্তু এসব লাভ শুধু জামাতে সালাত পড়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কোন ব্যক্তি যদি জামাতে সালাত আদায়ের প্রতিজ্ঞা করে, জামাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমন করে, (যদিও সে জামাত পায়নি) জামাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অপেক্ষা করতে থাকে, এমনকি সালাত আদায়কারী জামাতে নামাজ আদায় শেষে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সে ছাওয়াব পেতে থাকবে।

নিম্নে এর বিশদ আলোচনা করা হল

এক. যে ব্যক্তি মসজিদে জামাতে সালাত আদায় করাকে বেশি বেশি ভালোবাসে আল্লাহ তাআলা কেয়ামত দিবসে আরশের নীচে তাকে ছায়াদান করবে, যেদিন আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। রাসূল সা. বলেন: "সাত ব্যক্তিকে কেয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া দেয়া হবে, যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না –

১) ন্যায় পরায়ণ বাদশা।
২) ঐ যুবক যে তার যৌবন আল্লাহর এবাদতে কাটিয়েছেন।
৩) যে লোকের অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।
৪) দুই ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য পৃথক হয়।
৫) একজন ক্ষমতাবান সুন্দরী রমণী তাকে আহ্বান করলে, উত্তরে সে বলল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৬) এক ব্যক্তি এমন গোপনে দান খয়রাত করল, তার বাম হাত জানে না ডান হাতে কি দান করল।
৭) যে নির্জনে আল্লাহর স্মরণ করল, এবং তার চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

মসজিদে আগমনের ফজিলতঃ

বর্ণিত সওয়াব একমাত্র ঐ ব্যক্তি পাবে যে জামাতে নামাজ আদায় করার জন্যই ঘর হতে বের হয়। এ বিষয় বর্ণিত হাদিস: "যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ফরজ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হয়, তার সওয়াব এহরাম বেঁধে হজের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সমপরিমাণ।" [আবুদাউদ:৪৭১]

রাসূল সা: বলেন: "গভীর অন্ধকারেও মসজিদে আগমনকারীদেরকে কেয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ প্রদান করুন।"[আবুদাউদ:৪৭৪]। রাসূল (সা :আরো বলেন (: "যে ব্যক্তি সকাল ও বিকালে মসজিদে গমন করে আল্লাহ তাআলা প্রতিবারই তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।" [বোখারি[৬২২:

সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকা ব্যক্তি সালাতের সওয়াব পাবে। রাসূল সা: বলেন : তোমাদের কেউ সালাতের অপেক্ষা করতে থাকলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওজু নষ্ট না হয়, সে সালাতের সওয়াব পেতে থাকবে। আর ফেরেশতারা তার জন্য এ বলে দোয়া করবে- হে আল্লাহ তাকে মাফ কর; তাকে রহম কর; ও দয়া কর ; (মুসলিম:১০৬৩)

প্রথম কাতারের ফজিলতঃ

এ ফজিলত বিশেষ করে ঐ ব্যক্তি পাবে যে জামাতে সর্বাগ্রে উপস্থিত হয় এবং প্রথম কাতারে অংশগ্রহণ করে। প্রথম কাতারের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস: "লোকেরা প্রথম কাতার ও আজানের ফজিলত কি তা যদি জানতো, আর তা লটারি ছাড়া লাভ করা সম্ভব না হত তবে তারা লটারিতেও অংশ গ্রহণ করত।" [বোখারি:৫৮০]

গুনাহ মাফ হয়ঃ "যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সালাতের ওজু করে তারপর ফরজ নামাজের উদ্দেশ্যে পথ চলে এবং মসজিদে জামাতে সালাত আদায় করে আল্লাহ তাআলা তার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" [মুসলিম:৩৪১]

দোজখের আগুন হতে নিষ্কৃতি ও নিফাক হতে পরিত্রাণ।

রাসূল (সা:) বলেন: "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবৎ প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে সালাত আদায় করে আল্লাহ তাকে দুটি পুরস্কার প্রদান করেন।

১. দোযখের আগুন হতে মুক্তি। ২. নেফাক হতে নিষ্কৃতি।" [তিরমিযি:২২৪]

জামাতে সালাত আদায় একা একা আদায় হতে সাতাশ গুন বেশি মর্যাদা রাখে। উল্লেখিত সকল ফজিলত ছাড়াও ইশা ও ফজরের নামাজ জামাতে আদায়কারীর জন্য বিশেষ ফজিলত হাদিসে বর্ণনা করা হয়। এর কারণ, এ দুই সালাতের সময় সাধারণত বিশ্রাম, গভীর অন্ধকার ও ভয়-ভীতির সম্ভাবনা থাকে। এ দুই সালাত মুনাফেকদের জন্য ঈমানের বিলুপ্তির কারণ হয় আর মোমিনদের জন্য কারণ হয় ঈমান বৃদ্ধি এবং অধিক সওয়াব লাভের। রাসূল (সা:) বলেন: "যদি এশা ও ফজরের সালাতের ফজিলত সম্পর্কে জানতে পারতো তাহলে তারা হাতে পায়ে ভর করে হলেও সালাতে অংশ গ্রহণ করতো।" [বোখারি:৫৮০] এবং রাসূল সা: বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে, সে আল্লাহর জিম্মায়-দায়িত্বেই থাকে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মা-দায়িত্ব বিনষ্ট করে আল্লাহ তাকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিবরানী) আল্লাহর জিম্মা বিনষ্টের মাঝে দুটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত।

১. জামাতে ফজরের সালাত আদায়ে অলসতা করা। ফলে আল্লাহর মাঝে যে চুক্তি তা ভঙ্গ হয়ে যায়।
২. যে সব ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহর জিম্মার অন্তর্ভুক্ত হল, তাদের কোন ধরনের কষ্ট দেয়া।

এ ছাড়াও ফজর এবং এশার সালাত জামাতে আদায় সম্পর্কে যে সকল হাদিস বর্ণিত আছে তন্মধ্যে একটি হাদিসে বলা হয়, এশার সালাত জামাতে আদায় করা অর্ধেক রাত জাগ্রত থেকে এবাদত করার সমান, আর ফজরের সালাতও যদি জামাতে পড়া হয় তা হলে সারা রাত ক্বিয়ামুললাইল এর-সমতুল্য ছাওয়াব পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ফজর ও আছরের সালাতে ফেরেশতাদের উভয় দল দুনিয়াতে একত্রিত হয়।

সালাত ত্যাগকারীর বিধান

সালাত ত্যাগ করার মত আর কোন বড় গুনাহ হতে পারে না। সালাত ত্যাগ করার মানে হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ -খুঁটি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করা। ইসলামের মাঝে সালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও সালাত পরিত্যাগ করা যে কত বড় গুনাহ তা বর্ণনা দেয়ার অবকাশ রাখে না। আমরা কোরানের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আল্লাহ সালাত ত্যাগকারীদের নয়, বরং ভুলে সালাত আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে কঠিন হুমকি দিয়েছেন, আর যারা নামাজ ত্যাগকারী ও সালাত নষ্টকারী, তাদের কি পরিণতি হবে, তা বলাই বাহুল্য। দেখুন,

আল্লাহ সালাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন:

"আর পরিতাপ সেই নামাজিদের জন্য , যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী। " [সুরা মাউন:৪-৫]

সালাত বিনষ্টকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

"তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীগণ -তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল ; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" [সুরা মারয়াম :৫৯]

অসংখ্য হাদিস দ্বারাও সালাত ত্যাগ কারীর ক্ষতি প্রমাণিত হয় এবং কোন কোন হাদিসে সালাত ত্যাগকারীকে কাফেরও বলা হয়। যেমন , রাসূল সা: এর বাণী, তিনি বলেন: "ব্যক্তি ও কুফর-শিরকের মাঝে ব্যবধান হল সালাত ত্যাগ করা।" [মুসলিম:১১৬]

তিনি আরো বলেন : "আমাদের মাঝে আর অমুসলিমদের মাঝে চুক্তি হল সালাত , যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে যাবে।" [আহমদ:২১৮৫৯]

রাসূল সা: জামাতে সালাত পড়া হতে বিরত থাকে এমন লোকদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। সমগ্র ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে , যারা নামাজ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে তারা কাফের , আর যারা সালাতের প্রতি উপহাস - বিদ্রূপ ও সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে ছেড়ে দেয় তারাও কাফের।

ওলামাগণ বলেন -আর যে ব্যক্তি সালাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু অলসতা বা অমনোযোগী হওয়ার কারণে সালাত ত্যাগ করে, তখন কর্তৃপক্ষ তাকে তওবা করার জন্য আদেশ দেবে। যদি সে তাওবা করে তাকে ক্ষমা করা হবে আর যদি তওবা না করে এবং সালাত ত্যাগের উপর অটল থাকে -তাকে হত্যা করার ব্যাপারেও সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন।

তার এ হত্যা করাটা কি হদ হিসেবে নাকি মুরতাদ বা কাফের হিসাবে ?-এ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মত পার্থক্য আছে। যারা বলেন হদ হিসাবে হত্যা করা হবে তাদের মতানুসারে তার জানাজা পড়া হবে , মুসলমানদের কবরে তাকে দাফন করা হবে , এবং মুসলমান উত্তর সুরীরা তার সম্পত্তিতে মীরাছ পাবে। আর যেসব ওলামা বলেন -তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে , তাদের মতে তার উপর জানাজা পড়া হবে না , তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা হবে না এবং তার সম্পত্তি মুসলমানদের বাইতুল মালে মালে ফাই বলে গণ্য হবে তার পরিবার পরিজন কেউ ওয়ারিশ হতে পারবে না। নবী করিম(সাঃ)এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম,কুফুর ও মুনাফেকী যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবান কারীর ডাক শুনিয়া মসজিদে হাজির হয়না। (তারগীব;আহমদ;তাবারানী)

উক্ত হাদিস শরীফে কত কঠোরভাবে সতর্ক করা হইয়াছে যে,যাহারা জামাতে হাজির হয়না তাহাদের এই কাজকে কাফের ও মুনাফেকের কাজ বলা হইয়াছে।আরেক হাদিসে এরশাদ হইয়াছে, মানুষের দূরভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে,মুআযযিনের আযান শুনিয়া মসজিদে হাজির হয় না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,এক ব্যক্তি সারাদিন রোজা রাখে এবং সারারাত্র নফল নামাজ পড়ে কিন্তু জুমআ ও জামাতে শরীক হয় না তাহার সম্পর্কে কি বলেন ।তিনি উত্তর করিলেন লোকটি জাহান্নামী(তারগীব;তিরমিযী)

রাসুল(সাঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন,যে গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোক থাকে আর সেখানে জামাতের সহিত নামাজ পড়া হয় না,তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে ফেলে ।কাজেই জামাতকে জরুরী মনে কর ।দলত্যাগকারী ছাগলকে বাঘে খাইয়া ফেলে। আর মানুষের বাঘ হইল শয়তান।

নবী করীম(সাঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন,যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া কোন ওজর ব্যতিত জামাতে হাজির হয় না তাহার নামাজ কবুল হয়না।সাহাবায়ে কেরাম(রাযিঃ)আরজ করিলেন,ওজর বলিতে কি বুঝায়?বলিলেন,অসুস্থাতা বা ভয়-ভীতি।

সালাত ত্যাগের পরিণতির বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখুন | সালাত ত্যাগী অবশ্যই প্রদীপ্ত আগুন তথা জাহান্নামের সন্নিকটেই অবস্থান করছে। তাই আমাদের উচিত খুব তাড়াতাড়ি তওবা করা এবং দ্রুত সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং সালাতে যত্নবান হওয়া।

নামাজ ভঙ্গ হওয়ার প্রসিদ্ধ কারণ ১৯টি:

১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া।

নামাজের ভেতর কিরাতে যদি এমন পরিবর্তন হয়, যার ফলে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে, আবার তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/৬৩৩-৬৩৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৮০, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/৩৪৪)

২. নামাজের ভেতর কথা বলা।

নামাজে এমন কোনো অর্থবোধক শব্দ করা, যা সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(হোক সেটা এক অক্ষর বা দুই অক্ষরে ঘটিত) তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক : ২/২)

মুআবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস সুলামি (রা.) নওমুসলিম অবস্থায় নামাজে কথা বললে রাসুল (সা.) নামাজের পর তাঁকে বলেন, 'নামাজের মধ্যে কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা যথোচিত নয়। বরং প্রয়োজনবশত তাসবিহ, তাকবির বা কোরআন পাঠ করতে হবে।' (মুসলিম, হাদিস : ৫৩৭)

৩. কোনো লোককে সালাম দেওয়া।

নামাজরত অবস্থায় কোনো লোককে সালাম দিলে নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৯২, আল বাহরুর রায়েক ২/১২০)

৪. সালামের উত্তর দেওয়া।

নামাজরত অবস্থায় কারো সালামের উত্তর দেওয়া নামাজ ভঙ্গকারী কাজ। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠিয়েছেন, আমি গেলাম ও কাজটি সেরে ফিরে এলাম।

অতঃপর নবী করিম (সা.)-কে সালাম করলাম। তিনি জবাব দেননি। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল, যা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে মহানবী (সা.) আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জবাব দিলেন না।

ফলে আমার মনে প্রথমবারের চেয়েও অধিক খটকা লাগল। (নামাজ শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জবাব দিলেন ও বললেন, 'নামাজে ছিলাম বলে তোমার সালামের জবাব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিবলা থেকে অন্য মুখে ছিলেন।' (বুখারি, হাদিস : ১২১৭)

৫. উহ্-আহ্ শব্দ করা।

নামাজরত অবস্থায় কোনো ব্যথা কিংবা দুঃখের কারণে উহ্-আহ্ শব্দ করলে নামাজ ভেঙে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৪, মারাকিল ফালাহ ১/১২১)

৬. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া।

অপ্রয়োজনে কাশি দেওয়ার দ্বারাও নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৬১৮, মারাকিল ফালাহ ১/১২১, আল বাহরুর রায়েক ২/৫)

৭. আমলে কাসির করা।

ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে ওই ব্যক্তি নামাজরত নয়। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত ৩/৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে ১/২৪১)

৮. বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।

দুনিয়াবি কোনো বিপদ-আপদ কিংবা দুঃখের কারণে শব্দ করে কাঁদলে নামাজ ভেঙে যায়। (হাশিয়াতু তাহতাবি ১/৩২৫, ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৯, নূরুল ইজাহ, পৃ. ৬৮)

৯. তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা।

নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় অনাবৃত থাকে, তাহলে তার নামাজ হবে না। তাই যদি কোনো ব্যক্তির গেঞ্জি , শার্ট বা প্যান্ট নাভির নিচ থেকে রুকু সিজদার সময় সরে গিয়ে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় এভাবে অতিবাহিত হয় , তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামী ১/২৭৩, কাফি ১ /২৩৮, মাওয়াহিবুল জলীল ১ /৩৯৮, মুগনিল মুহতাজ ১ /১৮৮, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৭)

নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ওড়না ছাড়া নামাজ আদায় করলে আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না।' (আবু দাউদ : ৬৪১, তিরমিজি : ৩৭৭, ইবনে মাজাহ : ৬৫৫)

১০. মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) লওয়া।

যেমন—ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন , সঙ্গে সঙ্গে নামাজের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২২, ফাতাওয়ায়ে আলগীরী ১/৯৮)

১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদে উত্তর দেওয়া।

সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া দুনিয়াবি কথার শামিল , তাই এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২)

১২. নাপাক জায়গায় সেজদা করা।

নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরি। অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় নামাজি ব্যক্তির শরীর যেসব জায়গা স্পর্শ করে , সে জায়গাগুলো পবিত্র হওয়া , যা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। তাই নাপাক বা অপবিত্র জায়গায় সেজদা করলে নামাজ ভেঙে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৭, তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৯৫)

১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া।

কোনো কারণে কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে গেলে নামাজ ভেঙে যায়। তবে যানবাহনে নামাজের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন। (মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮)

১৪. নামাজে কোরআন শরিফ দেখে পড়া।

নামাজরত অবস্থায় কোরআন শরিফ দেখে দেখে পড়লে নামাজ ভেঙে যায়। (মারাকিল ফালাহ ১ /১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১ /৩৩৬) তবে সৌদি আরবের আলেমরা এ মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।

১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা।

নামাজে শব্দ করে অট্টহাসি দিলে ওজুসহ ভেঙে যায়। (কানযুদ্দাকায়েক ১/১৪০)

১৬. নামাজে সাংসারিক কোনো বিষয় প্রার্থনা করা।

নামাজরত সাংসারিক/দুনিয়াবি কোনো দোয়া করলে হানাফি মাজহাব মতে নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩)। তবে এ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্য মাজহাবের ভিন্নমত আছে।

১৭. হাসির জবাব দেওয়া।

নামাজরত অবস্থায় কারো হাসির (উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে) উত্তর দেওয়া কথা বলার নামান্তর। এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/১১৭)

১৮. নামাজে খাওয়া ও পান করা।

নামাজরত অবস্থায় কিছু খেলে বা পান করলে নামাজ ভেঙে যায়। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার নামাজরত অবস্থায় খেলেও নামাজ ভেঙে যাবে। (মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮)

১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানো। মুক্তাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের আগে চলে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে। তবে যদি (দুজনের জামাতে নামাজের ক্ষেত্রে) মুক্তাদি ইমামের পায়ের গোড়ালির পেছনেই দাঁড়ায় , কিন্তু তিনি লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর সিজদা ইমাম সাহেবকে অতিক্রম করে যায় , তাহলে তাঁর নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫৯, আল মাবসুত লিস সারাখসি ১/৪৩)প্রসিদ্ধ এই ১৯টি ছাড়াও নামাজ ভঙ্গ হওয়ার আরো কারণ আছে। যেমন —কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ইমামের আগে কোনো রোকন আদায় করে ফেলা , ইচ্ছাকৃত ওজু ভাঙার মতো কোনো কাজ করে ফেলা , পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া। ইত্যাদি নামাজ ভঙ্গের কারণ।

জুমার দিন : ফযীলত ও আমল

জুমার দিন এই উম্মতের প্রতি বিশেষ দান

আল্লাহ তাআলা পূর্বের জাতিবর্গকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিনে আমার জন্য বিশেষ একটি ইবাদত কর। কিন্তু তারা সেই শ্রেষ্ঠতর দিনটি নির্ণয় করতে ভুল করেছে। চিন্তা-ভাবনা করে ইহুদীরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য শনিবারকে নির্বাচন করেছে আর নাসারারা নির্ধারণ করেছে রবিবারকে। অথচ সবচেয়ে সম্মানিত দিন হল জুমাবার। এ দিনের অনেক ফযীলত, অনেক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে সে দিনটি উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করেছেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

نَحْنُ الآخِرُونَ السّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمّ هَذَا يَوْمُهُمُ الّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ
، فَهَدَانَا اللهُ، فَالنّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: اليَهُودُ غَدًا، وَالنّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

আমরা পরে আগমনকারীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রগামী হব। তবে অন্যদেরকে (আসমানী) কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে। এই দিন (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম একটি দিনে সকলে একত্র হয়ে বিশেষ ইবাদত করা) তাদের উপর ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক দিনটির পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষ আমাদের অনুগামী। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার পরের দিন শনিবার আর খ্রিস্টানদের শ্রেষ্ঠ দিন এর পরের দিন রবিবার।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৫)

অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমন করা ও আসমানী কিতাবের অধিকারী হওয়ার দিক থেকে আমার উম্মতে মুহাম্মদী অন্যান্য উম্মত থেকে পিছিয়ে আছি। কিন্তু যে দিনটিতে বিশেষ ইবাদতের জন্য আল্লাহ তাআলা অন্যান্য জাতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে দিনটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে অগ্রগামী। শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ দিন নির্ধারণের ব্যাপারে যেমন আমরা সবার থেকে এগিয়ে আছি তেমনি কিয়ামতের দিন মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও জান্নাতে দাখেল হওয়ার ক্ষেত্রেও উম্মতে মুহাম্মদী হবে সকল উম্মত থেকে অগ্রগামী।

আরেক হাদীসে বিষয়টি এভাবে এসেছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَضَلّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السّبْتِ، وَكَانَ لِلنّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْ
مِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدّنْيَا، وَالْأَوّلُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

আল্লাহ তাআলা আমাদের আগের উম্মতকে জুমার (সপ্তাহের এক দিন জমা হয়ে ইবাদত করার) ব্যাপারে সঠিক দিনের পথ দেখাননি। ফলে ইহুদীদের জন্য হয়েছে শনিবার আর খ্রিস্টানদের জন্য হল রবিবার। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদের এনেছেন এবং জুমার জন্য সঠিক দিনের নির্দেশনা দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা (সম্মানিত দিন) নির্ধারণ করেছেন এভাবে- জুমাবার, শনিবার, রবিবার।
(শ্রেষ্ঠ দিবস নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন অন্যান্যরা আমাদের অনুগামী) তেমনি কিয়ামতের দিনও তারা হবে আমাদের অনুসারী। আমরা দুনিয়ায় সবার শেষে আগমণকারী, কিন্তু কিয়ামতের দিন হব সবার থেকে অগ্রগামী। সেদিন আমাদের ফায়সালা করা হবে সকলের আগে।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১৩৬৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৩)

জুমার দিনের পাঁচটি বিশেষ ফযীলত

জুমার দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অন্যতম একটি বিষয় হল, এ দিন কালক্রমে সংঘটিত এমন কিছু মহাঘটনার নীরব সাক্ষী, যা পৃথিবীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল বা পৃথিবীকে নবজীবন দান করেছিল। এমনিভাবে এ দিনই সংঘটিত হবে ঐ মহাপ্রলয়, যা এই নশ্বর পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটিয়ে এক অবিনশ্বর জগতের সূচনা করবে। বদরী সাহাবী আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَ
طَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَفِيهِ تَوَفّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَ
قُومُ السّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرّبٍ، وَلَا أَرْضٍ وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ، إِلّا وَهُنّ مُشْفِقُونَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

নিশ্চয় জুমার দিন হল সমস্ত দিনের সর্দার। জুমার দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মহান দিবস। এমনকি এই দিন আল্লাহ তাআলার কাছে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর তথা ইসলামের দুই ঈদের দিন থেকেও মহান।
জুমার দিনের বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ দিন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এ দিন তাঁকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এদিনেই আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন। জুমার দিন একটা সময় আছে, যাতে বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাআলা তাকে তা-ই দান করবেন, যদি না সে হারাম কোনো বিষয়ের প্রার্থনা করে। তদ্রূপ, কিয়ামতও সংঘটিত হবে জুমার দিনেই।

নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা পর্যন্ত জুমার দিন (কিয়ামতের আশঙ্কায়) ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, সাগর সবকিছু জুমার দিন (কিয়ামতের আশঙ্কায়) উদ্বিগ্ন থাকে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৫৫৫৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৫৪৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৪১)

আরেক হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وفيه مات، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَقُومُ ا لسّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ شَفَقًا مِنَ السّاعَةِ، إِلّا الْجِنّ وَا لْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ.

সূর্য যেসব দিন উদিত হয় অর্থাৎ দিনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন। এদিন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে দুনিয়াতে নামানো হয়েছে। এদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। এ দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ও জিন ব্যতীত এমন কোনো প্রাণী নেই, যা কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়ে জুমার দিন ভোর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকে না। জুমার দিন একটা সময় আছে, কোনো মুসলিম যদি সে সময় নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।

(মুআত্তা মালেক, হাদীস ২৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০৩০৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৪৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১৪৩০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৭৭২)

জুমার দিনে সকল সৃষ্টিজীব ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে

উপরের দুটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, জুমার দিন সমস্ত প্রাণী এ ভয়ে আতঙ্কিত থাকে যে, না জানি আজই কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। আরেক হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

(قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.)

সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়া দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন নেই। মানুষ ও জিন ব্যতীত এমন কোনো প্রাণী নেই, যা জুমার দিন (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায়) ভীতসন্ত্রস্ত থাকে না।

(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, হাদীস ৫৫৬৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৬৮৭; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৬৪৬৮)

জুমার দিন সমস্ত দিনের সর্দার

আবু লুবাবা রা.-এর হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নিশ্চয় জুমার দিন হল সমস্ত দিনের সর্দার। জুমার দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মহান দিবস। আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীসেও উল্লিখিত হয়েছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন। বিষয়টি আরো একাধিক হাদীসে বিবৃত হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

সূর্য যে সব দিন উদিত হয় অর্থাৎ দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হল জুমার দিন। এই দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিন তাকে জান্নাতে দাখেল করা হয়েছে। ঐ দিনই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। কিয়ামতও সংঘটিত হবে এ দিনেই। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪০৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৮৮)

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
(قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.)

জুমার দিন হচ্ছে, সকল দিনের সর্দার। এই দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে জান্নাতে দাখেল করা হয়েছে এবং এই দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুমার দিনই সংঘটিত হবে কিয়ামত। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০২৬)

জুমার রাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে বান্দার আমল পেশ করা হয়

জুমার দিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, জুমারাতে আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দাদের আলম পেশ করা হয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ জুমারাতে আদম সন্তানের আমল (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হয়। তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের আমল কবুল করা হয় না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০২৭২; আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৬১২)

জান্নাতের 'ইয়াউমুল মাযীদ'

জুমার দিনের একটি বিশেষ ফযীলত হল, জান্নাতবাসীদের জন্য এ দিনটি মহা আনন্দ ও বিশেষ প্রাপ্তির দিন। জান্নাতে প্রতি জুমার দিন বিপুল আনন্দ ও প্রাপ্তির সমাহার ঘটবে। আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যাবস্থাপনায় নবী-রাসূল, নেককার বান্দাগণের মিলন-উৎসব হবে। সর্বোপরি জান্নাতীরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভে ধন্য হবে, যা হল জান্নাতের সর্বোচ্চ নিআমত। তাই ফিরিশতারা জুমার দিনকে স্মরণ করেন 'ইয়াউমুল মাযীদ' তথা অনন্য প্রাপ্তিদিবস নামে।

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَتَانِي جِبْرِيلُ بِمِثْلِ المِرْآةِ البَيْضَاءِ، فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الجُمُعَةُ، جَعَلَهَا اللهُ عِيدًا لَكَ وَلأُمَّتِكَ، فَأَنْتُمْ قَبْلَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فِيهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبدٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذِهِ النَّكْتَةُ السَّوْدَاءُ؟

قَالَ: هَذَا يَوْمُ القِيَامَةِ، تَقُومُ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا المَزِيدَ،

قَالَ: قُلْتُ: مَا يَوْمُ المَزِيدِ؟

قَالَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ فِي الجَنَّةِ وَادِيًا أَفْيَحَ، وَجَعَلَ فِيهِ كُثْبَانًا مِنَ المِسْكِ الأَبْيَضِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَنْزِلُ اللهُ فِيهِ، فَوُضِعَتْ فِيهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ لِلأَنْبِيَاءِ، وَكَرَاسِيّ مِنْ دُرٍّ لِلشّهَدَاءِ، وَيَنْزِلْنَ الحُورُ العِينُ مِنَ الغُرَفِ فَحَمِدُوا اللهَ وَمَجّدُوهُ.

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: اكْسُوا عِبَادِي، فَيُكْسَوْنَ، وَيَقُولُ: أَطْعِمُوا عِبَادِي، فَيُطْعَمُونَ، وَيَقُولُ: اسْقُوا عِبَادِي، فَيُسْقَوْنَ، وَيَقُولُ: طَيِّبُوا عِبَادِي فَيُطَيّبُونَ.

ثُمَّ يَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رِضْوَانَكَ، قَالَ: يَقُولُ: رَضِيتُ عَنْكُمْ،

ثُمَّ يَأْمُرُهُمْ فَيَنْطَلِقُونَ، وَتَصْعَدُ الحُورُ العِينُ الغُرَفَ، وَهِيَ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَمِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ.

জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসেছেন শুভ্র আয়নার মত একটা জিনিস নিয়ে। আয়নাটিতে একটি কালো দাগ। আমি বললাম, এটা কী?

জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেছেন, এটি হল জুমার দিন। এ দিনকে আল্লাহ তাআলা আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্য ঈদের দিন বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আপনারা ইহুদী ও নাসারা থেকে অগ্রগামী। (তাদের বিশেষ ইবাদতের দিন যথাক্রমে শনিবার ও রবিবার, যা জুমার দিনের পরে আসে।) এই দিন একটা সময় আছে, যে সময় বান্দা আল্লাহর কাছে যে কল্যাণই প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে তা-ই দান করেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, জুমার দিনকে কালো দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হল কেন?

জিবরীল আলাইহিস সালাম জবাব দিয়েছেন, এই যে কিয়ামত দিবস তা এ দিনেই সংঘঠিত হবে। আখেরাতেও জুমার দিনকে আমরা 'ইয়াউমুল মাযীদ' নামে স্মরণ করব।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, 'ইয়াউমুল মাযীদ' কী?

জিবরীল আলাইহিস সালাম উত্তর দিয়েছেন, জান্নাতে আল্লাহ তাআলা প্রশস্ত ও সুগন্ধময় একটা উপত্যকা বানিয়েছেন এবং এতে তিনি শুভ্র মেশকের একাধিক টিলা স্থাপন করেছেন। জুমার দিন এলে আল্লাহ তাআলা এ উপত্যকায় অবতরণ করবেন।

তখন সেখানে নবীগণের জন্য স্বর্ণের মিম্বরসমূহ রাখা হবে, শহীদগণের জন্য মুক্তার অনেক চেয়ার পাতা হবে এবং জান্নাতী হুরেরা আপন আপন কক্ষ থেকে অবতরণ করবে। এরপর সকলে মিলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও মাহাত্ম্যের স্তুতি গাইতে থাকবে।

জিবরীল আলাইহিস সালাম আরো বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন, (হে ফেরেশতারা!) আমার বান্দাদের (বিশেষ পোশাক) পরিধান করাও। সে অনুযায়ী তাদের সজ্জিত করা হবে।

তখন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেবেন, আমার বান্দাদের জন্য (বিশেষ) খাদ্য পরিবেশন কর। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাদের জন্যই বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা করা হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার বান্দাদের সামনে (বিশেষ) পানীয় উপস্থিত কর। সে হিসাবে তাদের সামনে পানীয় পরিবেশন করা হবে।

এরপর আল্লাহ তাআলার আদেশ, আমার বান্দাদের আতর-খোশবু লাগিয়ে দাও। তখন তাদেরকে সুরভিত করা হবে।

এবার আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, (হে আমার বান্দারা!) তোমরা আমার কাছে কী চাও?

তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা কেবল আপনার রিযা ও সন্তুষ্টি কামনা করি।

আল্লাহ তাআলা উত্তর দেবেন, আমি তোমাদের প্রতি রাজি হয়ে গেছি। (তবারানীর বর্ণনায় আছে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন এমন নিআমতের দ্বার উন্মুক্ত করবেন, যা কখনো কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো হৃদয় কল্পনা করেনি।)

তারপর সবাইকে নিজ নিজ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করবেন। সকলে আপন আপন জান্নাতে চলে যাবে এবং হুরেরা ঐসব কক্ষে আরোহণ করবে, যার প্রত্যেকটিই সবুজ (মূল্যবান রত্ন) পান্না বা লাল ইয়াকুতের তৈরি। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৪২২৮; মুজামে আওসাত, তবারানী ৩/৫৫, হাদীস ২১০৫৪)

জুমার দিনের আমল

জুমার দিনের সবচেয়ে বড় আমল তো হল, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জুমার নামায আদায় করা। ভালোভাবে পাক-পবিত্র হয়ে পরিষ্কার ও উত্তম জামা-কাপড় পরিধান করে শুরু ওয়াক্তে মসজিদে চলে যাওয়া এবং নামায ও দুআ-যিকিরে মগ্ন থাকা। এরপর একাগ্রতার সাথে ইমাম সাহেবের খুতবা শোনা এবং উত্তমরূপে জুমার নামায আদায় করা। এটাই হল, জুমার দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক ফযীলতের আমল। হাদীস শরীফে এই আমলের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে।

এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ হয়ে যায়

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

এক জুমা থেকে আরেক জুমা মধ্যবর্তী সময়ের (গোনাহের) জন্য কাফফারা (পাপমোচনকারী), যদি কাবীরা গোনাহ না করা হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৪; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৮১৪)

সালমান ফারসী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

<تَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ<؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ثُمّ قَالَ:

>تَدْرُونَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ<؟ قُلْتُ: اللهُ عَزّ وَجَلّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ فِي الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ: هُوَ الْيَوْمُ الّذِي جُمِعَ فِي هِ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ. قَالَ:

>لَكِنِّي أُخْبِرُكَ بِخَبَرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهّرُ ثُمّ يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمّ يُنْصِتُ، حَتّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، إِلّا كَانَتْ كَفّارَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الّتِي قَبْلَهَا، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ.

(قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.)

তুমি জানো, জুমার দিন কী?

উত্তর দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত আছেন।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, জুমার দিন কী?

আমি একই জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

তিনি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, বল তো জুমার দিন কী?

আমি তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বললাম, জুমা হল ঐ দিন, যাতে আদম আলাইহিস সালামকে জমা করা হয়েছে। (অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)

তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এসব কিছু না।) বরং আমি তোমাকে জুমার দিনের খবর (আসল ফযীলত) সম্পর্কে অবগত করছি। কোনো মুসলিম যদি পবিত্র হয়ে জামে মসজিদের দিকে হাঁটতে থাকে, এরপর ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত নীরব থাকে তাহলে এ নামায এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার গোনাহসমূহের কাফফারা (মোচনকারী) হয়ে যাবে, যদি ধ্বংসকারী তথা কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

(শারহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ৩৮২৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৩২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৭২৯; সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ১৬৭৭: মুজামে কাবীর, তবারানী ৬/২৩৭ (৬০৮৯) মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০২৮)

আবু সাঈদ খুদরী রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطّ أَعْنَاقَ النّا سِ، ثُمّ صَلّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ، حَتّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الّتِي قَبْلَهَا.

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, তার কাছে থাকা সুন্দরতম জামাটি পরিধান করল এবং সংগ্রহে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করল, এরপর জুমাতে উপস্থিত হল, কারো কাঁধ ডিঙ্গিয়ে গেল না, তারপর আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী সুন্নত-নফল পড়ল, অতঃপর খতীব (খুতবার জন্য) বের হওয়া থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকল, তার এই নামায এ জুমা থেকে সামনের জুমা পর্যন্ত (গোনাহের) কাফফারা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৭৭৮; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৭৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১০৪৬৫

সালমান আলখায়ের (সালমান ফারসী) রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَ رِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلّمَ الإِمَامُ، إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى.

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে, সাধ্যমত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে,৬ তেল ব্যবহার করবে বা নিজের ঘরে থাকা আতর মাখবে, এরপর জুমার দিকে বের হবে, (মসজিদে গিয়ে একসাথে থাকা) দুইজনের মাঝে গিয়ে বসবে না, যত রাকাত সম্ভব নামায পড়বে, এরপর ইমাম যখন খুতবা দেন তখন চুপ থাকবে। যে কেউই এসব করবে তাকেই এই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মাফ করা হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৮৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৫৫৬৩)

দশ দিনের গোনাহ মাফ হয়ে যায়

আল্লাহ তাআলা রহমত ও মাগফিরাতের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর রাসূলের যবানে ঘোষণা শুনিয়েছেন, জুমার নামাযের বদৌলতে দশ দিনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ال صَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

জুমার দিন যে ব্যক্তি মাথা ধুয়ে গোসল করে, এরপর উত্তম আতর ব্যবহার করে এবং তার জামাগুলো থেকে ভালো জামাটি পরিধান করে, তারপর নামাযের উদ্দেশে বের হয়, (মসজিদে গিয়ে একসাথে থাকা) দুইজনের মাঝে গিয়ে বসে না, অতঃপর মনোযোগের সাথে ইমামের খুতবা শোনে, ঐ ব্যক্তির এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। -সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৪০৩

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَ سَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে, এরপর জুমায় উপস্থিত হবে, তারপর মনোযোগ দিয়ে (খুতবা) শুনবে এবং চুপ থাকবে, তার দুই জুমার মধ্যবর্তী দিনগুলো এবং আরো তিন দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে কঙ্কর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল।৭ -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৫০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১২৩১

মোটকথা, এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, জুমার দিনের বিশেষ আমল হচ্ছে, উত্তমরূপে গোসল করা, সবচেয়ে সুন্দর জামাটি পরিধান করা,

খোশবু থাকলে ব্যবহার করা, একাগ্রচিত্তে খুতবা শোনা, মসজিদে কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সামনে যাওয়ার জন্য কাউকে ডিঙ্গিয়ে না যাওয়া এবং খুতবা চলাকালে কোনো কথা না বলা ও কঙ্কর স্পর্শ না করা তথা অনর্থক কোনো কিছু না করা।

যে ব্যক্তি এভাবে জুমার নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার এক সপ্তাহ, বরং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

জুমার দিনে বিপুল ফযীলতপূর্ণ আরো কিছু আমল আছে। পরবর্তী কোনো অবসরে সেগুলো নিয়ে কিছু মুযাকারা করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী।

১

بن الله عبد إسناده والترهيب: فِي الترغيب في المنذري حسن. وقال إِسْنَاد الزجاجة: هَذَا مصباح في البوصيري قال :
مَشْهُورُون ثِقَات رُوَاته وَبَقِيّة وَغَيره، أَحْمد بِهِ احْتج مِمّن وَهُوَ عقيل بن مُحَمّد

حسن الأرنؤوط: إسناده شعيب الشيخ ثِقَاتٌ. وقال المجمع: رِجَالُهُ في والهيثمي الترغيب في المنذري قال : ২.

المزيد يوم الآخرة في ندعوه الطبراني : >نحن رواية في جاء: ৩>.

8

الصَّحِيحِ، رِجَالُ يَعْلَى أَبِي المجمع: وَرِجَالُ في الهيثمي وقال صَحِيحٍ، بِسَنَدٍ يَعْلَى أَبُو الإتحاف: رَوَاهُ في البوصيري قال :
فِي وَالطّبَرَانِيّ الدّنْيَا أبي ابْن آخر: رَوَاهُ موضع في جيد. وقال بإسناد الأوسط في الطبراني الترغيب: رواه في المنذري وقال
الصّحِيح رُوَاة مسنده. وَرُوَاته في يعلى وَأَبُو قوي، جيد أَحدهمَا بِإِسْنَادَيْنِ الْأَوْسَط.

৫

بِإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِيّ دَاوُد أَبُو الخلاصة: رَوَاهُ في النووي مُسْلِمٍ. وقال شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ حَدِيثٌ الحاكم: هَذَا قال :
صَحِيح الحَدِيث المنير: هَذَا البدر في الملقن ابن حسن. وقال.

৬. যেমন- নখ কাটা, মোচ ছাঁটা, বগল পরিষ্কার করা, নাভির নিচ পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি।

৭. খুতবা চলাকালে যে ব্যক্তি কথা বলে বা অনর্থক কোনো কিছু করে সে জুমার ফযীলত থেকে মাহরূম হয়ে যায়। দ্রষ্টব্য : সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৫১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১১১১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৩৩, ২১৭৩০; মুসনাদে তয়ালিসী, হাদীস ২৩৬৫

দৈনন্দিন সুন্নত নামাজ

ফরজ নামাজের পাশাপাশি সুন্নত নামাজেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ , যথাযথভাবে সঠিক পদ্ধতিতে গুরুত্ব সহকারে সুন্নত নামাজ আদায় করার মাধ্যমে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুপম আদর্শ অনুসরণ ও তার প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুন্নত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয় , কিয়ামতের দিন কারও ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা মহান আল্লাহ সেই ঘাটতি পূরণ করবেন।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে ও পরে ১২ রাকাত সুন্নত নামাজ রয়েছে। এগুলো হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) সবসময় আদায় করতেন এবং সাহাবাদের আদায় করার নির্দেশ দিতেন। তবে কখনো কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন না। অসংখ্য হাদিসে সুন্নত নামাজের ফজিলতের কথা বলা হয়েছে।

ফরজ নামাজের আগে -পরে সুন্নত নামাজগুলো আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিসে সেগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে। হজরত উম্মে হাবিবা (রা.) বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাকাত নামাজ পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। এশার পরে দুই রাকাত। ফজরের আগে দুই রাকাত।' তিরমিজি : ৬৩৬২

ফরজ নামাজ শেষ করে সুন্নত নামাজ আদায় না করে কাতার থেকে উঠে আসা, একদিকে যেমন অন্য মুসল্লিদের ইবাদতে মগ্নতা ব্যাঘাত ঘটায় , নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। অন্যদিকে নামাজ পড়তে আসা মুসলিম শিশুরাও এ ধারাটি অব্যাহত রাখতে শেখে। বড়দের দেখাদেখি তারাও এভাবে সংক্ষিপ্তভাবে নামাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যা কোনোভাবেই উচিত নয়।

ইসলামি শরিয়তে সুন্নত ওই আদেশমূলক বিধানকে বলা হয় , যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য নয়, তবে তা হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়মিত আমল থেকে প্রমাণিত। সুন্নত দুই প্রকার : সুন্নতে মোয়াক্কাদা ও সুন্নতে জায়েদা। সুন্নতে মোয়াক্কাদা ওই সব কাজ, যেগুলো হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত এমনভাবে আমল করতেন যে তা ওজরবিহীন কখনো ছাড়তেন না।

যথা পুরুষদের জামাতে নামাজ পড়া। এ ধরনের সুন্নতের বিধান হলো এসব সুন্নত ওজরবিহীন নিয়মিত ছেড়ে দেওয়া গোনাহ , তবে হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়তে পারবে। ওজরবিহীন এমন সুন্নত ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা হবে , তবে তাকে ফাসেক বা কাফের বলা যাবে না। আত তাআরিফাতুল ফিক্বহিয়্যাহ : ৩২৮

সুন্নতে মোয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতোই। অর্থাৎ ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি সুন্নতে মোয়াক্কাদার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুনিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে , আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে কখনো মাফ পেয়েও যেতে পারে। তবে শাস্তিও পেতে পারে। তাই ফরজ নামাজের আগে-পরের সুন্নতে মোয়াক্কাদার অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সুন্নতে জায়েদা ওই সুন্নত , যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত আমল করলেও ওজরবিহীন মাঝেমধ্যে ছেড়ে দিতেন। এমন সুন্নতকে মুস্তাহাব , নফল ও মানদুব বলা হয়। এমন সুন্নতের বিধান হলো , তার ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ , তবে বিনা প্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না। যথা তাহাজ্জুদসহ অন্য নফল নামাজ। তবে এ ধরনের আমলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো আমল অন্য আমলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়। কোনো কোনো আলেমের মতে , মোস্তাহাব-নফলের চেয়ে সুন্নতে জায়েদা তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ।

কাশফুল আসরার : ২/৩০২

দৈনন্দিন নফল নামাজ

মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ফরজ। তবে নফলের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। আর নফল ইবাদতের মধ্যে নফল নামাজ আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজের বাইরেও কিছু নফল নামাজ রয়েছে।

হাদিসে যেসব নামাজের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে, যেমন—এক সাহাবি প্রশ্ন করেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কী? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন : 'তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সিজদা করবে (বেশি বেশি নফল নামাজ পড়বে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করো তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।' (সহিহ মুসলিম : ১/৩৫৩)

তাহাজ্জুদ :

ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। পবিত্র কোরআনে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।' (সুরা : সিজদা, আয়াত : ১৬)

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ।' (মুসলিম, হাদিস : ১১৬৩)

ইশরাক :

সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন।

এ সময় দোয়া , তাসবিহ পাঠ ও দ্বিনি আলোচনা করতেন । সূর্যোদয়ের পর তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এই আমলের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা অন্যদেরও (. ,বলেন (.সা) রাসূলুল্লাহ ,থেকে বর্ণিত (.রা) উৎসাহিত করেছেন। আনাস ইবনে মালেক ’যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করল এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে বসে থাকল; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করল , সে একটি পরিপূর্ণ হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাবে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৫৮৬)

দুহা : সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার আগ মুহূর্তে ‘দুহা’র নামাজ আদায় করা হয়। পৃথকভাবে আদায় করার অবকাশ থাকলেও অনেকেই এটাকে ইশরাকের নামাজ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সময়ের শুরুতে আদায় করলে সেটা ইশরাক আর সময়ের শেষে আদায় করলে দুহা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমার প্রিয়তম (রাসুল সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন , যেন আমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা , দুহার নামাজ ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮)

আউয়াবিন :

মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়কৃত ছয় রাকাত নামাজ ‘আউয়াবিন’ নামে পরিচিত। আল্লামা মাওয়ার্দি এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (মুগনির মুহতাজ : ১/৩৪৩)। তবে কেউ কেউ ‘দুহা ‘নামাজকেই আউয়াবিনের নামাজ বলেছেন। নাম নিয়ে মতভিন্নতা থাকলেও এই সময় নামাজ আদায়ের গুরুত্ব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং এগুলোর মধ্যে কোনো মন্দ কথা না বলে , তার আমলনামায় বারো বছর ইবাদতের সওয়াব লেখা হবে।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১১৬৭)

তাহিয়্যাতুল অজু :

অজুর মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুই রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল অজু। নিষিদ্ধ সময়ের বাইরে যেকোনো সময় এই নামাজ আদায়ের অবকাশ রয়েছে। রাসুলে করিম (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৪)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ :

মসজিদে প্রবেশ করার পর আদায় করার নামাজ। আল্লাহ মসজিদে আসতে পারার কৃতজ্ঞতা ও মসজিদের সময়টুকু ফলপ্রসূ হওয়ার প্রার্থনা হিসেবে এই নামাজ পড়া হয়। নিষিদ্ধ সময় ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যায়। তবে নামাজের জামাত ও ওয়াক্তের নির্ধারিত সুন্নত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না। মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর বসে। ’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৬৭)

তাওবা : নামাজের সময় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। তাই হাদিসে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশনা রয়েছে। আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যখন কোনো বান্দা পাপ করে ফেলে, এরপর সে ভালোভাবে অজু করে এবং দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৫২১)

সালাতুত তাসবীহ : ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে বলেছেন,

يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، « ألا أُعْطِيكَ، ألا أمْنَحُكَ، ألا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ

خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَأَه وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا “হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না? আমি কি আপনাকে প্রদান করব না? আমি কি আপনার নিকটে আসব না? আমি কি আপনার জন্য দশটি সৎ গুনের বর্ণনা করব না যা করলে আল্লাহ তাআলা আপনার আগের ও পিছনের, নতুন ও পুরাতন, ইচ্ছায় ও ভুলবশত কৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন?

আর সে দশটি সৎ গুন হলো: আপনি চার রাকাআত সালাত পড়বেন ।প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাআতে যখন কিরাআত পড়া শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ{সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার } এরপর রুকুতে যাবেন এবঃ রুকু অবস্থায় (উক্ত দুআটি) ১০ বার পড়বেন। এরপর রুকু থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদায় যাবেন। সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন অতঃপর ১০ বার পড়বেন। এরপর আবার সিজদায় যাবেন এবং সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা ওঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এ হলো প্রতি রাকাআতে ৭৫ বার। আপনি চার রাকাআতেই অনুরূপ করবেন। যদি আপনি প্রতিদিন আমল করতে পারেন , তবে তা করুন। আর যদি না পারেন ,তবে প্রতি জুমআআয় একবার। যদি প্রতি জুমআয় না করেন তবে প্রদি মাসে একবার। আর যদি তাও না করেন তবে জীবনে একবার। ”(আবু দাউদ ১২৯৭, ইবনে মাজাহ ১৩৮৭, ইবনে খুজাইমা , ১২১৬, বায়হাকী ৪৬৯৫ শায়েখ আলবানী রাহি বলেছেন , হাদীসটি সহীহ। সহীহুল জামে, ৭৯৩৭)

দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়বে তারপর তাশাহহুদ পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাআত ও চতুর্থ রাকাআতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ নিয়মে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। কোন এক স্থানে উক্ত তাসবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবে। আর এই সালাতে কোন কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সিজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না, তবে আঙ্গুল চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে।

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে। উকবা বিন আমের জুহানী রাযি. বলেন,

"তিনটি সময়ে রাসুল সা. আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময় ; যতোক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্যঅস্ত যায়।"(সহহি মুসলিম)

বি.দ্রঃ- যেহেতু সূর্যের উদয় ও অস্ত সব সময় একই সময়ে হয় না , সেহেতু ঘড়ির সময় অনুপাতে তা বর্ণনা করা এই পরিসরে কঠিন। তাই , এর জন্য স্থায়ী ক্যালেন্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।সূর্যোদয়ের সময় ; যতক্ষণ না তার হলুদ রঙ ভালোভাবে চলে যায় , আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য আনুমানিক ১৫-২০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়।সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরয সালাতের আগে দুই রাকাআত-শুন্নাত ছাড়া অন্য নফল সালাত পড়া মাকরুহ। চাই তা ঘরে পড়া হোক কিংবা মসজিদে। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়্যাতুল অজু ' বা খুলুল মসজিদ পড়া অনুচিত। তবে ফজরের সুন্নতের সাথে তাহিয়্যাতুল অজু ও দুখলুল মসজিদ সালাতের নিয়ত করে নিলে তার সওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এবং জামাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বাকি সময় তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়া।

হযরত হাফসা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেন,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّى إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وفى رواية إلا ركعتي الفجر

"রাসূল সাঃ ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তেন না।"(সহহি বুখারি১১৭৩;সহহি মুসলিম১৭১১)

ইমাম তিরমিযী রাহি বলেন,

وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

"আহলুল ইলম একমত যে, কোনো ফজরের সময় হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অতিরিক্ত নফল পড়াকে মাকরুহ মনে করেন।"(তিরমিযি৭৫)

ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল সালাত পড়া মাকরূহ আসরের সালাতের পর সুর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত পড়া মাকরুহ।

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি রাসুল কে বলতে শুনেছি,

لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيب الشَّمْسُ

"ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।" (সহীহ বুখারী ৫৫১)

বি.দ্র- পূর্বের প্রত্যেকটি মাকরূহ সময়ে (ফজর টু ফজরের সালাত এবং ফজরের সালাত টু সূর্যোদয় এবং আসর টু মাগরিব) কাযা সালাত , জানাযার সালাত এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ নয়। "কেউ যদি ওই দিনের আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে- সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। কাযা করা যাবে না। কারণ রাসুল ইরশাদ করেন-

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাআত পেল সে আসরের সালাত পেল।(নাসায়ি৫১৮) মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়ার পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরূহ।

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন,

بين أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ إِلَّا الْمُغَرِبَ

“প্রতিটি দুই আযান (আযান ও ইকামাত) এর মাঝে (নফল) সালাত আছে মাগরিব সালাত ছাড়া ।(বায়হাকী,4172)

প্রত্যেক সালাতের আযান ও ইকামতে মাঝামাঝি সময়ে দুই রাকাআত সালাত পড়া নফল। আবশ্যক নয়। শুধু মাগরিব সালাতের ক্ষেত্রে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাৎ মাগরীবের আযান দিলে ফরজের আগে অন্য কোন সালাত নেই ।হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ। রাঃ কে প্রশ্ন করা হল , মাগরিবের (ফরজের আগে ও আজানের পর) আগে কোন সালাত আছে কি? তিনি বললেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا،

“আমি নবীজী সাঃ এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে এ সময় সালাত পড়তে দেখিনি ।(আবু দাউদ ১২৮৪)

উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাতের হুকুম। তবে অন্যান্য ফিকহী মাযহাবে এ সময়ে সালাতের সুযোগ রয়েছে।

ইমাম যখন জুমআ-ঈদের খুতবার জন্য বের হন, তখন থেকে ফরয সালাত থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত নফল সালাত পড়া মাকরুহ। ক. হযরত নুবাইশা হুজালী রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

"যখন কোন মুসলমান জুমআর দিন গোসল করে অতঃপর মসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব সালাত পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে এবং ইমাম সাহেব খুৎবা ও জুমআ শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে ; তাহলে, যদি এ জুমআয় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ২০৭২১)

হযরত উরওয়াহ রা. বলেন,

إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ

"ইমাম মিম্বারে বসলে কেউ কোন সালাত পড়বে না।" (ইবনে আবি সাইবা৫২১৩)

ইকামাতের সময়। সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

"যখন সালাত শুরু হয়, তখন ফরয সালাত ছাড়া আর কোন সালাত পড়া জায়েজ নয় "(তিরমিজী, ৪২১)

বি.দ্র. তবে ফজরের সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে ইকামাতের পরও মসজিদের কোনো কোণে তা আদায় করতে বলা হয়েছে , যদি দ্বিতীয় রাকাআত পাওয়া যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে।বহু সংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী এমন ছিলেন , যারা কখনো যদি মসজিদে এসে দেখতেন যে , ফজরের ইকামাত বা জামাত শুরু হয়ে গেছে , তাহলে মসজিদের ভেতরে জামাতের কাতার থেকে দূরে বারান্দায় বা মসজিদের এক প্রান্তে কিংবা খুঁটির আড়ালে ফজরের দু 'রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিতেন। তারপর জামাতে শরীক হতেন। আর কিছুসংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী মসজিদের ভেতরে তা পড়তেন না। তবে মসজিদের বাইরে ঘরে বা পথে অথবা মসজিদের দরজায় পড়তেন। তারপর ইমামের সাথে শরীক হতেন।

ক. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত ,(কৃষ্ণার গভর্নর) সায়ীদ ইবনে আস তাঁকে এবং হুযায়ফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে ফজরের সালাতের আগে ডাকলেন। তাঁরা (কাজ শেষে) তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد، فصلى الركعتين، ثم دخل في الصلاة

“ইতিমধ্যে মসজিদে ফজরের সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেছে। ইবনে মাসউদ রা. মসজিদের একটি খুঁটির আড়ালে ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন তারপর জামাতে শরীক হলেন।(শরহু মাআনিল আসার ১/৬১৯)

আবু মিজলায থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেন , আমি ফজরের জামাত চলা অবস্থায় ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইবনে উমর রা. জামাতের কাতারে প্রবেশ করলেন। আর ইবনে আব্বাস রা. ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন। -প্রাগুক্ত

উল্লেখ্য- কতিপয় সাহাবী-তাবেয়ী إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরয ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়)- এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইকামাত বা জামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়তেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু হুরায়রা রা. , আবু মূসা আশয়ারী রা., মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রাহি , তাঁরা إذا أقيمت الصلاةفلا صلاة إلا المكتوبة-এই হাদীসের বিধানকে সকল সালাত এমনকি ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করতেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী-তাবেয়ী ফজরের সুন্নাত অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় এই বিধান থেকে একে ভিন্ন মনে করতেন। হাদীসটিকে তাঁরা ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করতেন। ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাগিদ এবং আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনা থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয়। কোনো কোনো সাহাবী নবীজীর সামনে ফজরের ইকামাত চলাকালে মসজিদে সুন্নাত পড়েছেন।

এ ক্ষেত্রে নবীজী তাঁদেরকে সরাসরি নিষেধ করেননি বা এ কথা বলেননি যে , إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبةالمكتوبة (ফরযের ইকামাত শুরু হলে অন্য সালাত পড়া নিষেধ) বরং তিনি বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। যদি ইকামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়া সর্বাবস্থায় নাজায়েয হত, তাহলে তিনি স্পষ্ট নিষেধ করতেন বা বলতেন যে, ফরযের ইকামাত শুরু হলে অন্য সালাত পড়া নিষেধ।

বি.দ্র- সময় যদি এত কম হয় যে সুন্নাত পড়তে গেলে ফরয সালাত শেষ হয়ে যাবে , তাহলে সুন্নাত পড়া মাকরুহ। عند ضيق الوقت خوفاً من تفويت الفرض أو تأخيره ঈদের সালাতের আগে নফল সালাত পড়া এবং পরে | ইদগাহে | পড়া মাকরুহ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا۔

“রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন বের হলেন এবং দু ' রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। ”(সহীহ মুসলিম 1944)

আরাফার ময়দানে, বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য যোহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়া মাকরুহ। মুজদালিফায় বিশেষ করে হজ যাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا

“নবী (সা.) আরাফাহর ময়দানে এক আযান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু এ দুই সালাতের মধ্যখানে কোনো [সালাত] তাসবীহ পড়েননি।

অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামাতে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেছেন এবং দুই সালাতের মাঝখানে কোন তাসবীহ [সালাত] পড়েননি। (আবু দাউদ-1906)

"খুব ক্ষুধা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ওই অবস্থায় নফল সালাত পড়া মাকরুহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গেই মন লেগে থাকবে ; সালাতের সঙ্গে নয়। "(সহীহ মুসলিম, ৮৬৯) রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

"খানার উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই। "(সহিহ মুসলিম ৫৬০) সুতরাং যখন খানা তৈরী হয়ে যায় এবং সামনে উপস্থিত করা হয় , তখন আগে খানা খেয়ে নেয়া। কারণ , এমতাবস্থায় সালাতে একাগ্রতা আসে না।

রাসূল সা. বলেন,

إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب

"যখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়ে যায়, তখন মাগরিবের আগে খানা খেয়ে নাও।(বুখারী 672) খানা শেষ করতে তাড়াহুড়ো করো না

পস্রাব-পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ। আব্দুল্লাহ ইবনে আল-আরক্বাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে , তিনি (উরওয়া) বলেন , একদা সালাতের ইকামাত হয়ে গেল। তিনি (আব্দুল্লাহ) এক ব্যক্তির হাত ধরে তাকে সামনে ঠেলে দিলেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম) স্বীয় গোত্রে ইমাম ছিলেন (সালাত শেষে) তিনি বললেন , আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছিঃ

"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ

"সালাতের ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নেবে । (তিরমিযি ১৪২)

এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে , যে বস্তু সালাত থেকে বিমুখকারী এবং খুশু খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী ।(সহহি মুসলিম৮৬৯)

সালাতের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন কারুকার্য খচিত , লেখা ও ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত, রঙ্গিন ও ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান না করা ।আয়শা রা. বলেন , 'রাসূল সা. একটি কার্পেটে সালাত আদায় করার সময় তার কারুকার্যের প্রতি নজর পড়ে। সালাত শেষ করে বলেন, এ কার্পেটটি আবু জাহাম ইবনে হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও , আমার জন্য একটি আনজাবিয়া তথা কারুকার্যহীন কাপড় নিয়ে আস। এ কার্পেটটি সালাতের ভেতর আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।"(সহহি মউসলিম৫৫৬)

সালাতের মূল সময়

হযরত ইবনে আবনিত(রাযি) হইতে বর্ণিত,নবী করিম (সাঃ)বলেন,

أُمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى

أُمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأولى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْ مِثْلَ السّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ

عَلَى الصَّائِمِ

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ

.مِنْ قَبْلِكَ . وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

জিবরাইল (আঃ) কা'বা শরীফের চত্বরে দু'বার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথমবার যোহরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া ফিতার মত ছিল। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করালেন জুতার যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর 'এশার সালাত আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফযরের সালাত আদায় করালেন যখন ভোর বিদ্যুৎত্র মত আলোকিত হল এবং যে সময় রোযাদারের ওপর পানাহার হারাম হয় ।তিনি (জিবরাইল) দ্বিতীয় দিন যোহরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হল এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের সালাত আদায় করেছিলেন ।অতঃপর আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তারদ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন পূর্বের দিনের সময়ে ।অতঃপর 'এশার সালাত আদায় করালেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফযরের সালাত আদায় করালেন যখন যমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন , হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (সালাতের) ওয়াক্ত। সালাতের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে।"(তিরমীযী 149)

ফজর সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- সুবহে সাদিকের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরেরসালাতের সময় ।ওয়াক্তের শেষ- সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় ।ফজরের এই সময়টুকু দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শরিয়তের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে 'গালাস' আর দ্বিতীয় ভাগকে 'ইসফার" বলে। রাসূল সা. অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় অংশ তথা ইসফারে ফজরের সালাত আদায় করতেন। ফিকাহবিদগণ বলেন ; প্রথম ভাগ তথা 'গালাস" এর সময় মহিলাদের আর দ্বিতীয় ভাগ তথা 'ইসফার" এর সময় পুরুষদের ফজর সালাত আদায় করা উত্তম। "(দুররুল মুখতার 01/2৬৩)

যোহরের সালাতের সময় : ওয়াক্তের শুরু- ঠিক দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর যোহরের সালাতের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক জিনিসের ছায়ায়ে আছলি তথা মূল ছায়া ব্যাতিত

(অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকে ছায়া আসলী বলা হয়। ওয়াক্তের শেষ- যোহরের ওয়াক্তের সমাপ্তি এবং আসরের শুরুর সময় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। মালিকি , শাফিঈ ও হাম্বলি মাযহাবের মূলধারার মত হলো মধ্যাহ্নে কোনো বস্তুর যে ছায়া থাকে সেটিকে বাদ দিয়ে ,(এই সময় নির্ধারণ করার একটি সহজ পদ্ধতি হলো মাটিতে কোনো লাঠি পুঁতে রেখে তার ছায়ার দিকে লক্ষ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিগুণ হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত যোহরের সময় থাকবে।)বস্তুটির ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয় তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় এবং আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা রাহি , প্রধানতম দুই ছাত্র আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ আশ-শায়বানিও [সাহেবাঈন] সহ কিছু হানাফী ফক্বিহ এই একই মত পোষণ করেন। একটি ইমাম আবু হানিফা রাহি. দুটি মতের ; একটি মতও।অন্যদিকে, ইমাম আবু হানিফা রাহি , মতে মধ্যাহ্নে কোনো বস্তুর যে ছায়া থাকে [ছায়ায়ে আসলী; হলো ঠিক মধ্যাহ্নকালে কোন বস্তুর যে ছায়া হয় , তাই।] সেটিকে বাদ দিয়ে বস্তুটির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে এবং এরপর আসরের সালাতের সময় শুরু হয়। এই বিষয়ে হানাফি মাযহাবের মূলধারার মত এটিই।

ক. হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ বলেন,

أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِ الظُّهْرَ ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ

“আমি তোমাদের জানাচ্ছি যে , যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হয় , তখন যোহরের সালাত পড়, আর যখন তা দ্বিগুণ হয় , তখন আসরের সালাত পড়। ”(দুররুল মুখতার 01/2৬৩)

খ. আবূ হানীফা [রাহি.] এর দলীল হলো, আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ‘আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ .

“যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় , তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে।কেননা , গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।“(সহীহ বুখারী 533)

আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়ায়) এ সময়টাতেই গরম প্রচণ্ডতম হয়। সুতরাং উভয় হাদীস যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো তখন সন্দেহবশত সময় শেষ হবে না। বি.দ্র- ফক্বীহগণ বলেন,

ينبغي أن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين ولا يؤخر الظهر إلى أن يبلغ المثل ليخرج من الخلاف فيها،

"উত্তম ও সতর্কতা এটাই যে , বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার আগেই যোহরের সালাত শেষ করা। এবং ২ মিছিল হওয়ার পর আছরের সালাত পড়া শুরু করা। যাতে ইমামদের ইখতিলাফ থেকে বাঁচা যায়।" (-1/425-426، البحر الرائق، 1/359، رد المحتار، 173) তবে যদি কেউ পড়ে নেয়, তাহলে মতভেদ থাকার কারণে সালাতকে বাতিল বলা যাবে না। বরং সহীহ হয়ে গেছে বলেই ধর্তব্য হবে।

আসরের সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- যোহরের সালাতের সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের মূল ছায়া বাদ দিয়ে যখন ছায়া দ্বিগুণ হয় , তখনই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়।ওয়াক্তের শেষ- অতপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহে তাহরীমী ইবনে আবদুর রহমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا إِصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً

"এটা মুনাফিক্বদের সালাত! এটা মুনাফিক্বদের সালাত!! এটা মুনাফিক্বদের সালাত!!! এদের কেউ বসে থাকে আর যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের দু শিংয়ের মধ্যখানে বা উপরে অবস্থান করে তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। তাতে সে খুব সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।"(সহহি মুসলিম/আবু দাউদ,৪১৩)

মাগরিবের সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু। ওয়াক্তের শেষ- পশ্চিমাকাশে লাল রং [লালিমা] দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত সময় বাকি থাকে।

মাগরিবের সালাত বিলম্ব করা মাকরুহমাগরিবের সালাতের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে নেওয়া উত্তম। সাধারণভাবে দুই রাকাআত সালাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে, বিনা ওজরে এর থেকে বেশি সময় ব্যায় করা মাকরুহ।(ইমদাদুল ফতোয়া 01/1৫১, ফাতোয়ায়ে শামি ০১/৩৬৯)

এশার সালাতের সময়

ওয়াক্তের শুরু- মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হওয়ার পরই এশার সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্তের শেষ- সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় বাকি থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ দেরি করে এশার সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। আর বিনা ওযরে অর্ধ রাতের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরুহ।(ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ০২/৫২ , আহসানুল ফতোয়া ০২/১৩০, আল বাহরুর রায়েক ০১/২৪৬)

যদি আমাদের সামনে হাদিসে বর্ণিত সময়গুলো থাকে , তাহলে কখনো সময় নির্ধারক যন্ত্র না থাকলেও সঠিক সময়ের সালাত আদায় করতে পারবো।

বিতরের সময়

ওয়াক্তের শুরু- বিতরের প্রথম সময় হলো এশার পরে ওয়াক্তের শেষ- শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়। খারিজাহ ইবনে হুযাফা আল-আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে এসে বললেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ .

“মহা মহীয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত সালাত দিয়েছেন , সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতির। তোমাদের জন্য এ সালাত আদায়ের সময় হচ্ছে ‘এশা সালাতের পর হতে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।"(আবু দাউদ-১৪১৮)

মুস্তাহাব সময়; শেষ রাতে বিতিরকে প্রলম্বিত করা মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি , রাসুলুল্লাহ (সা.) বিতির কোন সময়ে আদায় করতেন? তিনি বলেন,

كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ .

“রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে-এগুলোর প্রত্যেক সময়েই বিতির আদায় করেছেন। তবে তিনি ইন্তিকালের পূর্বে বিতির সালাত সাহারীর শেষ সময়ে আদায় করেছেন।’(সহীহ বুখারী ও মুসলিম/আবু দাউদ 1435)

তাহাজ্জুদের সালাতের ওয়াক্তওয়াক্তের শুরু- তাহাজ্জুদের সময়সীমা এশার সালাতের পর থেকে ।ওয়াক্তের শেষ - ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত।সুতরাং কাহারো যদি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার দরুন এশারসালাতের পড়েই তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে নেয় , তবে সেও সওয়াব পাবে , ইনশাআল্লাহ।তাহাজ্জুদের প্রধান সময়রাতের শেষ প্রহর। শেষ প্রহর বলতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে ফজরসালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্তকে বোঝানো হয়েছে।জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

“যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে, সে যেন শুরু রাতেই বিতির পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে (ইবাদত) করার লালসা রাখে , সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিতির সমাধান করে। কারণ , রাতের শেষ ভাগের সালাতে ফেরেশতারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমল।”(সহীহ মুসলিম ৭৫৫)

সালাতের মুস্তাহাব সময়

ফজরের সালাত ফর্সা করে পড়া মুস্তাহাব রাফি ' ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ ". أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.

"ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফজর সালাত আদায় করবে। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যাধিক সওয়াব বা অতি উত্তম বিনিময় রয়েছে।"(আবু দাউদ 424)

গ্রীষ্মকালে যোহরকে শীতল করে পড়া মুস্তাহাবআবু হুরায়রা (রাঃ) ও 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় , তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা , গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।"(সহীহ বুখারী 533)

আসরকে দেরী করে পড়া মুস্তাহাব আলী ইবনে শায়বান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

"একদা আমরা মদীনা হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত আসরের সালাত বিলম্ব করে আদায় করলেন। "(আবু দাউদ ৪০৮)
মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি আসরের সালাত পড়া মুস্তাহাব বুরায়দাহ আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেন ; আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি সা বলেন,

بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

“তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) সালাত আদায় করবে। কারণ যার আসরের সালাত ছুটে যায় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।”(ইবনে মাজাহ৬৯৪)

মাগরিবের সালাতের মুস্তাহাব সময় মারসাদ ইবনে ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত,রাসূল সা. বলেন,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

“আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সালাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। ”(আবু দাউদ ৪১৮)

এশার সালাতের মুস্তাহাব সময়

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

“যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম ; তাহলে তাদেরকে এশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম।”(তিরমিযি ১৬৭)

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ মানুষকে তার এবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষ নয় ; মানুষ ও জ্বীন- উভয় জাতিকে আল্লাহ তার এবাদত তথা তার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন - وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

ফলে তিনি মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক এবাদতের প্রচলন করেছেন।

দৈহিক এবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান এবাদত হল সালাত। সালাত এমন এক টি এবাদত যাকে আল্লাহ তার মাঝে এবং তার বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন।

সালাত মোমিনের অন্তর ও মনুষত্বকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করে এবং তাকে কল্যাণকর কাজে উৎসাহ জোগায় ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য শক্তি জোগায়। এছাড়া সালাত অন্তরে আল্লাহর ধ্যানকে বদ্ধমূল করে এবং ওয়াক্ত সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পূরণে সমর্থন দেয় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা ও আলস্যকে পরাজিত করে।

সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায় ।সে তার প্রভু বা স্রষ্টাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। এ সালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কংটকমুক্ত হয়। সালাত ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ ফি রিয়ে আনে। গড়ে উঠে সামাজিক ঐক্য। সালাতের মাধ্যমে ছগীরা তথা ছোট ছোট গুনাহগু লতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয়।

সর্বশেষে এ কথাই বলতে চাই, ব্যক্তি জীবনে মুক্তির জন্য নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। আ মরা বাস্তব জীবনে যে যা কিছু করি না কেন পরকালীন শান্তির জন্য নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ ব্যাপারে হাদীস কোরআনে অনেক বর্ণনা রয়েছে। সেসব বিষয় ছোট আ লোচনায় টেনে আনা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করি।

তথ্য সূত্র

ফিকুহুস সালাত, ফাযায়েলে আমাল, মুন্তাখাব হাদিস, সালাতের গুরুত্ব এবং ফজিলত কিতাব, গুগোল ক্রোম এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট।